মাসুদ রানা

মরণখেলা ১



কাজী
আনোয়ার
হোসেন

gvm` ivbv

giY‡Ljv‡Ð1

KvRx Av‡bvqvi †nv‡mb

এক

আঠারোই ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার।

বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা রেখা চিরে দিল কালো আকাশটাকে, কড়াৎ করে একটা বাজ পড়ল কোথাও। ঘনঘোর দুর্যোগের রাত, ঝড়ো হাওয়ায় নুয়ে নুয়ে পড়ছে বন-বাদাড়ের ঝাঁকড়া মাথা, একটানা তুমুল বর্ষণে থই থই করছে জলাভূমি আর ধু-ধু প্রান্তর। ওদেশে ফেব্রুয়ারি মানেই তো এই–প্রবল ঝড়, ঘন ঘন বজ্রপাত, আর তুমুল বৃষ্টি।

কুউউ, ঝিকঝিক ঝিকঝিক। ঝড়-বৃষ্টি মানামানি নেই, বত্রিশটা বগি নিয়ে ঘণ্টায় নব্বুই মাইল গতিতে ছুটে চলেছে ফ্লোরিডা এক্সপ্রেস। বাঁধনহীন চাকায় গতির উল্লাস, সমস্ত যান্ত্রিক শব্দ এক হয়ে বারবার যেন একই সুরে গাইছে, যাকে পাই তাকে খাই, যাকে পাই তাকে খাই। দুশো মাইলের মধ্যে কোথাও কোন বিরতি নেই। বন্ধ জানালার বাইরে হিম শীতল প্রকৃতি ফুঁসছে, সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেম থাকায় ট্রেনের ভেতরটা গরম। রাত প্রায় বারোটা, স্লিপিং কারের ভেতর কম্বল মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে বাংলাদেশী এক যুবক।

প্রশস্ত স্লিপিং কারটাকে দু’ভাগ করেছে সরু একটা করিডর।

করিডরের দু'পাশে ভারী পর্দা ঘেরা দুটো কেবিন। নরম বিছানায় শুয়ে দোল খাচ্ছে ঘুমন্ত আরোহী, সাউন্ড-প্রুফ দরজা জানালা দিয়ে ঝড় বা ডিজেল ইঞ্জিনের কোন আওয়াজই ভেতরে ঢুকছে না। কান পাতলে শুধু পাশের কেবিন থেকে ভেসে আসা প্রৌঢ় এঞ্জিনিয়ারের নাক ডাকার মৃদু শব্দ শোনা যাবে।

বিশ মাইল সামনে ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে চারজন সশস্ত্র লোক। ধু-ধু প্রান্তরের মাঝখানে এটা একটা পরিত্যক্ত স্টেশন, বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে কোন জনবসতি নেই। চারজনই ওরা দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ, দাঁড়িয়ে আছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। প্রত্যেকের পরনে কালো সুট, সুটের ওপর ওভারকোট, ওভারকোটের ওপর রেনকোট, মাথায় চওড়া কার্নিসঅলা হ্যাট। প্রত্যেকে শোল্ডার হোলস্টার পরে আছে, দু'জন এরই মধ্যে হোলস্টার থেকে বের করে ওভারকোটের পকেটে রেখেছে রিভলভার। ফ্লোরিডা এক্সপ্রেসের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।

সবচেয়ে লম্বা লোকটা ওদের দলপতি, ছয় ফিট দু'ইঞ্চি। কব্জি থেকে ওভারকোটের হাতা সরিয়ে হাতঘড়ির লিউমিনাস ডায়ালে চোখ বুলাল সে। বিশ মাইল দূরে রয়েছে ট্রেন, ট্রেনের সামনে ইতিমধ্যে বদলে গেছে সিগন্যাল। হতভম্ব ড্রাইভার বাধ্য হয়ে ব্রেক চাপ দিতে শুরু করেছে। দু'ঘণ্টার মধ্যে কোথাও থামার কথা না থাকলেও সিগন্যালকে অগ্রাহ্য করবার সাধ্য নেই তার।

'ট্রেনে ব্যাটা থাকলে হয়,' দলপতির পাশ থেকে সংশয় প্রকাশ করল একজন, দু'হাতের ভেতর আড়াল করা দোমড়ানো সিগারেটে কষে একটা টান দিল সে। ঠাণ্ডায় হি হি করছে।

কটমট করে লোকটার চোখের দিকে তাকাল দলপতি,

চেহারায় তীব্র ভর্ৎসনা। 'আছে,' শান্ত গলায় আশ্বস্ত করল সে। 'হেডকোয়ার্টারের ইনফরমেশন ভুল হতে পারে না।'

'থাকলেও,' বলে খানিক ইতস্তত করল ধূমপায়ী, 'ওর সম্পর্কে যা শুনলাম, ট্রেন থেকে নামানো সহজ হবে বলে মনে হয় না।'

'এটা দেখে বাপ্ বাপ্ করে নেমে আসবে।' ওভারকোটের পকেট থেকে পয়েন্ট ফরটিফাইভ কোল্ট রিভলভারটা বের করে দেখাল দলপতি। সিলিন্ডার চেক করে আবার সেটা পকেটে রেখে দিল সে। 'মনে আছে তো, আমাদের নাটকের এক-আধজন দর্শক থাকতে হবে। আর অভিনয়ে কোন খুঁত থাকা চলবে না।'

'মাসুদ রানা...মাইরি বলছি, নামটার মধ্যে কেমন যেন ইস্পাত ইস্পাত, নিরেট একটা ভাব আছে...'

'ভয়ের কিছু নেই। সে একা, আমরা চারজন...'

'কিন্তু খেপে গেলে সে নাকি একাই একশো...'

'আরে রাখো, অমন বীরপুরুষ কত দেখলাম!' তাচ্ছিল্যের সাথে মন্তব্য করল একজন।

আরেকজন ঝাঁঝের সাথে বলল, 'আহত করা যাবে না, এ আবার কি কথা! ও যদি ব্যাপারটা টের পেয়ে যায়, কি অবস্থা হবে ভাবতে পারো? এক একজনকে ধরে আছাড় মারবে, অথচ আমরা তার গায়ে আঁচড়টাও কাটতে পারব না!'

'নির্দেশ নির্দেশই,' দলপতির গম্ভীর তিরস্কার শোনা গেল। 'সব কথা জানো না, কাজেই চুপ করে থাকো। আর, আহত করা যাবে না মানে আমি বলতে চেয়েছি, লোকটাকে অচল করা যাবে না। বিশেষ করে পা, চোখ, আর হাত যেন অক্ষত থাকে। কেউ গুলি করবে না, কারণ কোথায় লাগতে কোথায় লাগে তার ঠিক

নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওর নাক বা দাঁত ভাঙা যাবে না। অফিসে ওর ওপর টরচার চালানো হবে বলে শুনে এসেছি। শুধু লক্ষ রাখতে হবে, লোকটা যেন অচল হয়ে না পড়ে।'

সতেরো মাইল দূরে রয়েছে ফ্লোরিডা এক্সপ্রেস। চেহারায় রাজ্যের উদ্বেগ নিয়ে ঝড়ো রাতের দিকে তাকিয়ে আছে ড্রাইভার। এইমাত্র পেরিয়ে আসা সিগন্যালের নির্দেশ ছিল, গতি কমাতে হবে। অথচ দু'ঘণ্টার মধ্যে ট্রেনের কোথাও থামার কথা নয়। কি ঘটছে কী?

স্পীড ধীরে ধীরে কমিয়ে আনছে ড্রাইভার। ইস্পাত-মোড়া ছাদে ঝাঁক ঝাঁক বৃষ্টি পড়ছে, কাঁচমোড়া দরজা আর জানালার বাইরে দাপাদাপি করছে বাতাস। পরবর্তী সিগন্যালকে পাশ কাটিয়ে এল ট্রেন। টকটকে লাল সঙ্কেত–মানে, সামনে বিপদ। ট্রেন থামাবার চূড়ান্ত নির্দেশ। এর মানেটা কি? ব্রেকের ওপর চাপ আরও বাড়াল ড্রাইভার। সেডার ফলসের কাছাকাছি চলে এসেছে ট্রেন। সামনে পরিত্যক্ত স্টেশন। অনির্ধারিত বিরতি।

দু'মিনিট পর একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ফ্লোরিডা এক্সপ্রেস। কড়কড় কড়াৎ করে কাছে পিঠে কোথাও একটা বাজ পড়ল। ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরল মাসুদ রানা, ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল, সারা শরীর শিউরে উঠল গোপন পুলকে। স্বপ্ন দেখছে রানা, মধুর সুখে ওর শরীর-মন ভরপুর।

করিডরের দু'পাশের পর্দা হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলা হলো। ভেজা রেনকোট পরা তিনজন লোক রানার বিছানার সামনে দাঁড়াল। কেবিনের মেঝেতে পানি জমছে। দলপতির হাতে

পাসপোর্ট সাইজের একটা ফটো, রানার চেহারার সাথে ফটোটা মেলাল সে। 'হ্যাঁ, এই লোকই, ডিক,' শান্ত গলায় বলল সে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা। কোল্ট ফরটিফাইভের কালো মাজ্‌ল্‌ লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। 'সরাও ওটা,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'গুলি বেরিয়ে যেতে পারে, তোমার হাত ভিজে।'

এক নিমেষে বিপদ আঁচ করে নিয়েছে রানা। ট্রেন চলছে না, তিন আগন্তুকের গায়ে ভিজে রেনকোট, প্রৌঢ় আরোহীর বিস্ফারিত চোখে স্পষ্ট আতঙ্ক। দলপতির দু'পাশে দাঁড়ানো লোক দু'জন রিভলভার বের করেনি, তবে রেনকোটের বোতাম খুলে ওভারকোটের পকেটে হাত ভরে রেখেছে। ওদের একজন রানার দিকে একটু পাশ ফিরে আছে, লক্ষ রাখছে অপর আরোহীর দিকে।

'কাপড় পরো,' কঠিন সুরে নির্দেশ দিল দলপতি। 'ট্রেন থেকে নামতে হবে তোমাকে।'

'মামার বাড়ির আবদার?' উদ্বেগ গোপন করে ফোঁস করে উঠল রানা। 'কে তুমি?' রানা এজেন্সির শাখা অফিসগুলোয় সারপ্রাইজ ভিজিট দিচ্ছে ও, বিরতিহীন এক হপ্তা চরকির মত আমেরিকার এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্লান্ত। সম্ভাবনাগুলো সতর্কতার সাথে বিবেচনা করল। অতর্কিতে ঝটকা মেরে দলপতির হাত থেকে রিভলভারটা ফেলে দিতে পারে। একই সাথে তার ডান পাশে দাঁড়ানো লোকটার তলপেটে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারতে পারে। তৃতীয় লোকটা ওভারকোট থেকে রিভলভার বের করার আগেই…না, ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। গুলি শুরু হলে

বেচারা এঞ্জিনিয়ার মারা যেতে পারে।

'রেক্স, এফ.বি.আই.,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল দলপতি। 'তাড়াতাড়ি করো—ট্রেন তোমার জন্যে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকবে...'

'নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে তোমাদের,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'আমি একজন বাংলাদেশী...,' হুকের সাথে ঝুলন্ত জ্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল ও।

'ওয়াচ ইট!' গর্জে উঠল রেক্স। চোখের পলকে তার দুই সঙ্গীর হাতে রিভলভার বেরিয়ে এল।

'আমি নিরস্ত্র,' ব্যঙ্গ মেশানো মুচকি একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। ওদের হুমকি গ্রাহ্য না করে হুক থেকে জ্যাকেটটা নামাল ও। 'পাসপোর্ট বের করছি।' তিনটে রিভলভারের মাজ্‌ল্ ওর দিকে তাক করা, দেখেও না দেখার ভান করল ও। ভেতরের পকেট থেকে দু'আঙুলে ধরে সাবধানে পাসপোর্টটা বের করে দলপতির দিকে বাড়িয়ে দিল।

এক হাত ব্যবহার করেই পাসপোর্টটা খুলল রেক্স, খুঁটিয়ে দেখল, তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'জাল পাসপোর্ট, ডিক—তাও একেবারে কাঁচা হাতের কাজ।' রানার দিকে ফিরল সে, পাসপোর্টটা নিজের পকেটে ভরল। 'বুঝতেই পারছ, তুমি ধরা পড়ে গেছ। এখন আর কোন কৌশলই কাজে আসবে না। লক্ষ্মী ছেলের মত যাবে, নাকি টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হবে?'

'ওটা যদি জাল পাসপোর্ট হয়, তাহলে তোমরাই বলো, আমি কে?' জিজ্ঞেস করল রানা। দ্রুত চিন্তা করছে ও। এদের সাথে কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু মুক্তি পেতে হলে ট্রেন থেকে নামতে হবে ওকে। মোক্ষম একটা সুযোগ দরকার, নিরীহ একজন

আরোহীর উপস্থিতিতে তা পাওয়া যাবে না।

জবাব না দিয়ে হাতঘড়ি দেখল রেক্স, রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি।

'আমি জন ফাইবার,' করিডরের ওদিক থেকে বলল প্রৌঢ় এঞ্জিনিয়ার। 'এই ভদ্রলোকের সাথে আমার কথা হয়েছে। বললেন, রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির উনি ডিরেক্টর...'

'ভদ্রলোক, হুঁহ্!' ঘড়ি থেকে চোখ তুলে এঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকাল রেক্স। 'রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি ওকে আমাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে গরুখোঁজা করছে।' রানার দিকে ফিরল সে। 'আল মাসুদ, হাত দুটো এক করে বিছানার ওপর রাখো!'

গায়ের কম্বল সরিয়ে বিছানা থেকে নামল রানা। দ্রুত এক পা পিছিয়ে গেল রেক্স। দেখা গেল টাই, জ্যাকেট আর জুতো ছাড়া কাপড়চোপড় পরেই শুয়েছিল রানা।

'আমরা নেমে গেলেই ট্রেন ছাড়বে,' রানার টাই আর জুতো পরা শেষ হতে এঞ্জিনিয়ারকে বলল রেক্স। 'তখন আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারবেন। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিন যে বদমাশটার সাথে এতক্ষণ থেকেও প্রাণটা খোয়াননি।'

জ্যাকেট পরতে পরতে নির্লিপ্ত চোখে দলপতির দিকে তাকাল রানা, প্রতিবাদ করল না।

'ওটা তোমার ব্যাগ?' জিজ্ঞেস করল রেক্স, উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ডান পাশের সহকারীকে ইশারা করল সে। সহকারী টেবিল থেকে রানার ব্যাগটা তুলে নিল। 'এবার হাত দুটো এক করে...' রেক্সের বাঁ পাশের লোকটার হাতে একটা হ্যান্ডকাফ দেখা গেল...।

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'হয় আমি এভাবেই যাব, না হয় আমাকে গুলি করতে হবে–কি করবে ঠিক করো।'

করিডর ধরে এগোল ওরা। রানার সামনে ব্যাগ হাতে ডিক, পিছনে রিভলভার হাতে রেক্স আর তার অপর সহকারী। দু'পাশের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল আরোহীরা, ছোট্ট মিছিলটা দেখে বিস্মিত হলো। খালি পায়ে ওদের পিছু পিছু এল এঞ্জিনিয়ার জন ফাইবার। তাকে বলতে শোনা গেল, 'ওর সম্পর্কে কিছুই তো বললেন না! আমি হয়তো সাহায্য করতে পারতাম...'

উঁচু গলায় জবাব দিল রেক্স, সবাই যাতে শুনতে পায়, 'কুখ্যাত খুনী। ফলসাম জেল থেকে পালিয়েছে।'

ধীর পায়ে হাঁটছে রানা, ঝুলে পড়েছে কাঁধ দুটো। সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে, যেন আড়ষ্ট ভাবটা এখনও কাটেনি। ওর দিকে চেয়ে পিছন থেকে মুচকি হাসল রেক্স। ভাবল, লোকের অভ্যেসই এই, তিলকে তাল করা! এই লোক নাকি একাই একশো! হতে পারে–উলুবনে শেয়াল রাজা!

ট্রেনের বাইরে এ যেন আরেক জগৎ। সিঁড়ি বেয়ে রানা প্ল্যাটফর্মে নামতেই শীত, বৃষ্টি, আর বাতাস একযোগে হামলা চালাল। সেডার ফলস বনভূমির কিনারায় পরিত্যক্ত স্টেশন, বিদ্যুৎ চমকে ওঠায় নির্জন একতলা ভবনটাকে ভূতের আস্তানা বলে মনে হলো।

এঞ্জিন রূম ছেড়ে ড্রাইভার নামেনি, তবে কয়েক ফিট দূরে গার্ড আর ড্রাইভারের সহকারীকে দেখা গেল, এঞ্জিন রূম থেকে বেরিয়ে আসা আলোয় দাঁড়িয়ে ভিজছে। শেডের নিচে পৌঁছুতেই ভিজে গোসল হয়ে গেল রানা। হঠাৎ ওদের সবার গায়ে চোখ

ধাঁধানো এক ঝলক আলো পড়ল।

‘হল্ট!’ পিছন থেকে নির্দেশ দিল রেক্স। ‘ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করব আমরা। টিমোথি, ক্যামেরা থেকে ফিল্মটা খুলে নিয়ে এসো!’

এঞ্জিন রূমের দিকে ছুটে গেল টিমোথি, আলোটা ওদিক থেকেই এসেছে। ড্রাইভারের সহকারী আর গার্ডের সাথে চাপা স্বরে কথা বলল সে। কিছু একটা হাত-বদল হলো। টিমোথি ফিরে আসতে শুরু করল, লোক দু'জন উঠে পড়ল ট্রেনে।

এক মুহূর্ত পর সচল হলো ট্রেন।

সুযোগের অপেক্ষায় আছে রানা, রেক্স সেটা ভাল করেই জানে। রানার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রয়েছে সে, হাতের রিভলভার বুক বরাবর তাক করা। রানার পিছনে রয়েছে ডিক।

টিমোথি ফিরে আসতে চারজনের দলটা প্ল্যাটফর্মের আরেক দিকে চলে এল। ঠাণ্ডায় হি হি করছে রানা। ওকে কাঁপতে দেখে সকৌতুকে হাসল রেক্স। ট্রেনের শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে সে বলল, ‘দুঃখিত, একটু কষ্ট দিলাম। আমাদের অফিসে তোমার জন্যে গরম কফি আর যাবতীয় আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা আছে, গেলেই দেখতে পাবে!’ ডিকের সাথে তার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় রানার নজর এড়াল না।

স্টেশন থেকে নেমে বিশ গজের মত এগোল ওরা, বাঁকের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড গাড়িটা। হেডলাইট জ্বলছে। ড্রাইভারকে নিয়ে সংখ্যায় প্রতিপক্ষ হলো চারজন।

সামনের দরজা খুলল ডিক, মাথা নিচু করে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসতে যাচ্ছে টিমোথি। পিছনের সীটের দরজা খুলে রানাকে

পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল রেক্স। কোন রকম কৌশল না করে গাড়ির ভেতরে ঢুকল রানা। সামনের সীটে মাত্র বসেছে টিমোথি, ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিক। রানা গোবেচারা ভঙ্গিতে বসে আছে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকাল ড্রাইভার। পিছন থেকে তার মাথার চুল খামচে ধরল রানা।

বাঁ কাঁধ, বাঁ হাত, আর মাথা দিয়ে সবেগে দরজার গায়ে পড়ল রানা, ডান হাতে ধরে আছে ড্রাইভারের চুল। ঠিক যেন বিনা শব্দে একটা বোমা বিস্ফোরিত হলো গাড়ির ভেতর। সীটের পিঠ টপকে এল ড্রাইভার, পিছনের সীটের দরজার কাছে মেঝেতে মাথা পড়ল, পা দুটো সামনের সীটের পিঠে আটকে গেছে। দরজার গায়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে রানা, দরজার ধাক্কায় রাস্তার পাশে চিৎ হয়ে পড়েছে রেক্স। ঝুঁকে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল সে, নাকটা চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। গাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে তার বুকের ওপর পড়ল রানা, এক ঝটকায় কেড়ে নিল হাতের রিভলভার।

কোল্ট অটোমেটিকটা রেক্সের থেঁতলানো, রক্তাক্ত নাকের ফুটোয় চেপে ধরল রানা। গোটা ব্যাপারটা চোখের পলকে ঘটে গেলেও হাতের ব্যাগ ফেলে দিয়ে এরই মধ্যে রানার দিকে রিভলভার ধরেছে ডিক।

'গুলি করো,' আহ্বান জানাল রানা। 'তবে রেক্সের আশা ছেড়ে দিয়ে!' হেডলাইটের আলো ওদের কারও গায়েই সরাসরি পড়ছে না, তবে আলোর আভায় প্রত্যেককেই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা।

গাড়ির ভেতর গোঙাচ্ছে ড্রাইভার। দরজার ফ্রেমের সাথে মাথা ঠুকে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে সে, সামনের জোড়া সীটের মাঝখানে পা

আটকে যাওয়ায় প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। হাঁ করে জানালা দিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে টিমোথি, তার হাতে ধরা রিভলভারের ব্যারেল জানালার ফ্রেমে ঠেকে রয়েছে।

বাঁ হাত দিয়ে কপাল থেকে ভিজে চুল সরাল রানা, হাতটা কপালে রেখে বৃষ্টির ফোঁটা থেকে চোখ দুটোকে আড়াল করল। 'দুটোই ছুঁড়ে দাও এদিকে,' ঝড়ের শোঁ শোঁ আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ওর গলা।

বৃষ্টির পানিতে প্রতি মুহূর্তে ধুয়ে যাচ্ছে রক্ত, ফ্যাকাসে দেখাল দলপতি রেক্সকে। ডিক আর টিমোথি ইতস্তত করছে দেখে খেঁকিয়ে উঠল সে, 'যা বলছে করো!'

রেক্সের বুকের ওপর বসে তার হাত দুটো জুতোর নিচে চেপে রেখেছে রানা। রেক্সের মাথার কাছে প্রায় এক সাথে পড়ল রিভলভার দুটো, তুলে নিয়ে পকেটে ভরল রানা। 'এবার ড্রাইভারের রিভলভার। তারপর গাড়ি থেকে বের করো ওকে।'

'ড্রাইভার নিরস্ত্র...' শুরু করল ডিক।

'আমি বলছি, কোন চালাকি নয়, ডিক!' রানার নিচে থেকে হুঙ্কার ছাড়ল রেক্স।

ড্রাইভারের রিভলভার তার পকেটেই ছিল, সেটা বের করে রানার দিকে ছুঁড়ে দিল টিমোথি। গুলিগুলো বের করে নিয়ে দূর ঝোপের দিকে রিভলভারটা ছুঁড়ে দিল রানা। মাথায় হাত দিয়ে, টলতে টলতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ড্রাইভার।

'প্রত্যেককে আলাদা ভাবে আদেশ করতে হবে নাকি?'

রানার ঝাঁঝ লক্ষ করে ভিজে বিড়ালের মত টিমোথিও বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। ওদের তিনজনকে গাড়ির পাশে, পাঁচ হাত দূরে

এক লাইনে দাঁড় করাল রানা। ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে রেক্সের বুক থেকে উঠল ও। পিছিয়ে এসে গাড়ির পিছনের দরজাটা বন্ধ করল। ওদের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে সামনের দরজা দিয়ে উঠে বসল গাড়িতে।

'রানা, শোনো...' আবেদনের সুরে বলল রেক্স, উঠে বসেছে সে, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে নাকের রক্ত মুছছে।

'রানা? আল মাসুদ নই তাহলে?' জানালা দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। কোল্ট অটোমেটিকের ব্যারেল জানালার ফ্রেমে ঠেকে আছে। 'বুঝতেই পারছ, ইচ্ছে করলে সারারাত এই বৃষ্টির মধ্যে তোমাদেরকে আমি দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি। তা যদি না চাও, ঝটপট জবাব দেবে।'

'রানা, শোনো, প্লীজ,' হড়বড় করে বলল রেক্স। 'আমরা সি. আই. এ-র লোক, পরিচয়-পত্র আছে...।' কাছেপিঠে কোথাও একটা গাছ ভেঙে পড়ার মড়মড় শব্দ হলো, শেষ দিকের কথাগুলো চাপা পড়ে গেল।

'লেজে পা পড়তেই জাত বদলে ফেললে? বাপের নাম ভুলে যাওনি তো?' একটা হাত লম্বা করে দিল রানা। 'কই, দেখি।'

ওভারকোটের বোতাম খুলে শার্টের পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ড বের করল রেক্স। তার চারপাশে পানির স্রোত বয়ে যাচ্ছে, কাদায় হাত আর হাঁটু রেখে কোন রকমে উঠে দাঁড়াল সে।

রানার লম্বা করা হাতে কার্ডটা দিয়ে পিছিয়ে গেল রেক্স। গাড়ির ভেতরে আলো জ্বেলে কার্ডে একবার চোখ বুলিয়ে হাসল রানা। 'জাল—তাও একেবারে কাঁচা হাতের কাজ।'

'স্বীকার করি, তোমার খেপে যাওয়ার কারণ আছে,' নরম

সুরে, বিনয়ের অবতার সাজল রেক্স। 'কিন্তু সব কথা শুনলে তুমিও বুঝবে, এই অভিনয়টুকুর দরকার ছিল। একটা কাজে তোমাকে আমাদের দরকার, কিন্তু কাউকে সেটা জানতে দেয়া চলবে না, সে জন্যেই ট্রেনে মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে। তাছাড়া, এটা একটা ইমার্জেন্সী...'

অতি বিনয় চোরের লক্ষণ হলেও, রানার মনে হলো রেক্স সবটুকু মিথ্যে বলছে না। যদিও ওদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার সহজ কোন উপায় নেই। পরিচয়-পত্র জাল হওয়া খুবই সম্ভব। 'তোমাদের অপারেশনাল চীফের নাম বলো।'

প্রতিবাদ জানাল রেক্স, 'এটা একটা সিক্রেট।'

'আমার পরিচয়টাও তাই,' বলল রানা।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে অপারেশনাল চীফের নাম বলল রেক্স। এরপর রানা একের পর এক অনেকগুলো প্রশ্ন করল। রেক্সের উত্তর শুনে মোটামুটি সন্তুষ্ট হলো ও, এরা সম্ভবত সি.আই.এ-রই লোক, কিংবা সি.আই.এ-র ভেতর এদের ইনফরমার আছে। 'এবার আমার সম্পর্কে কি জানো বলো,' জিজ্ঞেস করল রানা।

গড়গড় করে বলে গেল রেক্স, 'তুমি মেজর মাসুদ রানা, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি তোমার একটা কাভার। এজেন্সির শাখা অফিসগুলো ভিজিট করার জন্যে আমেরিকায় এসেছ তুমি। তোমার বসের নাম মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। বলা যায় প্রায় অলৌকিকভাবে আজও তোমরা নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলেছ–না কম্যুনিস্ট ব্লকে ভিড়ছ, না পুঁজিবাদী দুনিয়ায়।

তোমাদের একটা নীতি আছে, সেই নীতির মূল কথা হলো সুপারপাওয়ারগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা। তাই মাঝে মধ্যে তোমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরক্তি উৎপাদন করো, আবার কখনও সোভিয়েত রাশিয়ার। কিন্তু মজার কথা হলো, প্রায়ই দেখা যায়, তোমাদের সাহায্য ছাড়া কে.জি.বি. বা সি.আই.এ-র চলে না। তাই সবাই পারতপক্ষে তোমাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে চায়।

'দুঃখিত, অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। এবার তোমার সম্পর্কে বলি। তুমি মেজর মাসুদ রানা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের...'

'তেল মাখাবার ভাল ট্রেনিং পেয়েছ,' রেক্সকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'এবার বলো, আমাকে তোমাদের কি দরকার।'

'সব কথা কি আমাদের বলা হয়?' রেক্সকে প্রায় অসহায় দেখাল। 'ওয়াশিংটনে গেলেই তুমি জানতে পারবে...'

'ওয়াশিংটন?' রানার ভুরু কুঁচকে উঠল। 'তোমরা কি ওয়াশিংটন থেকে আসছ?'

'কুক্ষণই বলতে হবে, যাত্রার শুরুতেই বিপত্তি দেখা দেয়,' বলল রেক্স। 'গোটা আমেরিকার ওপর দিয়ে ইলিকট্রিকাল স্টর্ম বয়ে যাচ্ছে। কোন প্লেন ফ্লাই করছে না। অথচ তোমার ট্রেনকে থামাতে হলে প্লেনে করে আসতে হবে আমাদের। নিজেদের প্লেন আর পাইলট ছিল বলে আসতে পারলাম। বুঝতে পারছ তো, তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কি রকম ঝুঁকি নিয়েছি আমরা?'

'কিন্তু সবই বৃথা,' বলল রানা। 'তোমাদের সাথে আমি যাচ্ছি না। কারণ, এক, তোমাদের একটা কথাও আমি বিশ্বাস করছি না,

দুই, আমার কোন দায় পড়েনি যে সি.আই.এ-কে সাহায্য করব। মাইল ত্রিশেক হাঁটলেই লোকালয়ে পৌঁছে যাবে তোমরা। গুডবাই।'

'এক মিনিট,' দ্রুত বলল রেক্স, অস্থির দেখাল তাকে। ওভারকোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা খাম বের করল সে। 'এই চিঠিটা পড়ে দেখো, প্লীজ।' কয়েক পা এগিয়ে খামটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।

'কার চিঠি?'

'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের।'

জর্জ হ্যামিলটন গোপন একটা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির চীফ, প্রেসিডেন্ট ছাড়া অল্প দু'একজন এই এজেন্সি সম্পর্কে জানে। রাহাত খানের বন্ধু তিনি, রানাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। সম্ভব হলে রানার কোন অনুরোধ তিনি ফেলেন না, রানাও আপদে-বিপদে তাঁকে সাহায্য করে। খামটা খুলে চিঠিটা বের করল ও। ছোট্ট চিঠি, টাইপ করা, নিচের সইটা প্রথমে ভাল করে দেখল ও।

অ্যাডমিরাল লিখেছেন, 'রানা, সি.আই.এ-র অপারেশনাল চীফের সাথে ওয়াশিংটনে দেখা করো। সম্ভব হলে ওদের কাজটা করে দিয়ো। শুভেচ্ছা, জর্জ হ্যামিলটন।'

'এতক্ষণ এটা দেখাওনি কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সইটা তুমি জাল বলবে, তাই,' সাথে সাথে জবাব দিল রেক্স।

'তুমি বলতে চাইছ জাল নয়?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রেক্স, বাতাসের ধাক্কায় অনবরত টলছে সে। 'এরপরও যদি তুমি আমাদের কথা বিশ্বাস না করো, কিছু করার নেই। ছেড়ে দাও আমাদের, ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে

বলি, আমরা ফেল করেছি।'

দ্রুত কাজ করছে রানার মাথা। অ্যাডমিরালের সইটা চিনতে পেরেছে ও, জাল হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু ওকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে চিঠির ভাষা। অ্যাডমিরাল ওকে আদেশ করতে অভ্যস্ত নন, সম্পর্কটা সে রকম নয়, অথচ প্রথম বাক্যটা আদেশের সুরেই লিখেছেন তিনি। যেন ওয়াশিংটনে সি.আই.এ-র অপারেশনাল চীফের সাথে রানার দেখা করাটা একান্ত জরুরী, ওখানে যেন কি একটা খবর অপেক্ষা করছে রানার জন্যে। পরের বাক্যটা অবশ্য অনুরোধের সুরে লেখা, কিন্তু বাহুল্যবর্জিত ঢঙে। প্রতি দু'লাইনের মাঝখানে প্রায় সময়ই কিছু অলিখিত বার্তা থাকে, সেটা পড়তে পারছে না বলেই অস্বস্তি বোধ করল রানা। ওর মন বলছে, ওয়াশিংটনে যাওয়া দরকার। অথচ সি.আই.এ-র আচরণে ও বিরক্ত।

'ঠিক আছে, যাব আমি,' বলল রানা। 'কিন্তু আমার সাথে মাত্র একজন আসতে পারবে তোমরা–তুমি, রেক্স।'

'প্লীজ, রানা, এটা অমানবিক...,' প্রায় হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করল রেক্স। 'এই দুর্যোগের মধ্যে...'

'ঘুমন্ত মানুষকে ট্রেন থেকে নামানো অমানবিক নয়?' কঠোর দেখাল রানাকে। 'ইয়েস, অর নো?'

'আচ্ছা শালা, অফিসে পৌঁছে নিই!' মনে মনে বলল রেক্স। সঙ্গীদের দিকে ফিরল সে, নিচু স্বরে কথা বলল কিছুক্ষণ। তারপর ঘুরে গাড়ির দিকে এগোল।

'এয়ারপোর্ট এখান থেকে কত দূর?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তুমি ড্রাইভ করবে।'

দুই

উনিশে ফেব্রুয়ারি, শনিবার, রাত তিনটে। ওয়াশিংটন, সি.আই.এ-র অপারেশনাল হেড অফিস।

নিজের অফিসে পায়চারি করছেন জেনারেল স্যামুয়েল ফচ। ঠাণ্ডাকে তাঁর বড় ভয়, বোধহয় সেজন্যেই আর্কটিক জোনের অপারেশনাল চীফ বানানো হয়েছে তাঁকে। সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা দায়, ভুর ভুর করে কাঁচা রসুনের গন্ধ বেরোয় মুখ থেকে। মাঝারি আকৃতির শক্ত-সমর্থ মানুষ, শিশুর সারল্য মাখা চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই বুদ্ধির প্যাঁচ কষতে এই লোকের জুড়ি মেলা ভার। হিটিং সিস্টেম চালু থাকায় অফিসের ভেতর তাপমাত্রা তিরাশি ডিগ্রী ছাড়িয়ে গেছে, ওপরের দুটো বোতাম খোলা শুধু একটা শার্ট গায়ে ঘামছেন তিনি।

'আপনার মাসুদ রানা এইমাত্র এয়ারপোর্টে নামল,' জেনারেল ফচের সহকারী টমাস উড ফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল। 'গাড়িতে করে নিয়ে আসা হচ্ছে ওকে।'

জেনারেল ফচ থামলেন না, বরং আরও দ্রুত হলো পায়চারি, জোড়া ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে আছে।

আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল টমাস উড। 'এত থাকতে এই বাংলাদেশী মেজরকে কেন যে দরকার হলো আমাদের, আমি বুঝতে অক্ষম!' নরম কিন্তু অভিযোগের সুরে বলল সে। 'সহজ একটা অপারেশন, আমাদের ছেলেরাই করতে পারে। ইভেনকো

রুস্তভ কখন আই.আই. ফাইভে আসছে জানার সাথে সাথে আমরা একটা প্লেন পাঠাব, প্লেনটা তাকে নিয়ে ফিরে আসবে...'

'সহজ নয়,' টমাসকে থামিয়ে দিয়ে বললেন জেনারেল ফচ। 'হাতির তিমি গেলার মত কঠিন। তাছাড়া, গোড়াতেই ভুল করছ তুমি। ইভেনকো রুস্তভ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, শুধু যদি মাসুদ রানাকে পাঠানো হয় তবেই সে আসবে।'

মুখ বেজার করে টমাস বলল, 'রাশিয়ানদের এই মাসুদ রানা প্রীতি, অসহ্য!'

'রুশ প্রশাসন বা কম্যুনিস্ট পার্টির হর্তাকর্তারা রানাকে কি চোখে দেখে, আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না,' মুচকি হেসে বললেন জেনারেল। 'তবে রাশিয়া থেকে মিগ-একত্রিশ ছিনিয়ে আনার পর থেকে কিছু রুশ নাগরিক সত্যি ওর ভারি ভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে ইভেনকো রুস্তভ একজন। ছিনিয়ে এনে আবার ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে মিগটা, অর্থাৎ নিজের বিশ্বস্ততা এবং যোগ্যতা প্রমাণ করেছে রানা। অভিজ্ঞতাটা আমাদের জন্যে তিক্ত নিঃসন্দেহে, কিন্তু রাশিয়ানদের মধ্যে ব্যাপারটা যারা জানে তারা তো ওর ভক্ত হবেই।'

'ইভেনকো যাই বলুক, রানাকে সে তো আর চেনে না,' বলল টমাস। 'আমাদের একজন এজেন্টকে রানা বলে চালাতে অসুবিধে কি?'

'রাশিয়া থেকে এর আগে যারা পালিয়ে এসেছে তাদের চেয়ে ইভেনকো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, স্বীকার করো?'

নিরীহ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল টমাস। 'করি।'

'কাজেই আমরা কোন ঝুঁকি নিতে পারি না,' বললেন

জেনারেল ফচ। 'সোভিয়েত এন.পি.সেভেনটিন* থেকে রওনা হবে সে, আমাদের সবেচেয়ে কাছের রিসার্চ বেস আই.আই. ফাইভে পৌঁছুতে হবে। আই.আই. ফাইভ এই মুহূর্তে সোভিয়েত আইল্যান্ড থেকে পঁচিশ মাইল দূরে। ওখানে তিনজন প্রফেসর রয়েছে আমাদের, দ্বীপটা ভেঙে যাবে তাই ফেরত আসার জন্যে অপেক্ষা করছে। বুঝতে কোথাও অসুবিধে হচ্ছে, টমাস?'

'না, স্যার...'

'ইভেনকো পালিয়ে আসছে, তিন প্রফেসরের কেউই তা জানে না। আমরা বলিনি, কারণ ওদের কারও টপ সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স নেই।'

'আমাদের হয়তো উচিত রেডিয়োতে ওদেরকে আভাস দেয়া যে...'

'মাঝে মধ্যে ভাবি, তোমার সার্টিফিকেটগুলো জাল কিনা!' জেনারেল ফচের এটা প্রিয় একটা মন্তব্য, সুযোগ পেলেই ঝেড়ে দেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে টমাস উড এত বেশি অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন অর্জন করেছে, সবগুলোর কথা তার মনেও থাকে না। রুশ সহ ছয়টা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে টমাস। ক্রিপটোগ্রাফ এবং রেডিও-কমিউনিকেশন বিশেষজ্ঞ সে, আমেরিকার ছয়জন সেরা ইন্টারোগেটরের মধ্যে একজন। শুধু একটা ব্যাপারে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই, জীবনে কখনও মেরু-প্রদেশে যায়নি। বরফের রাজ্য সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই।

---

* আর্কটিকে সমস্ত ভাসমান সোভিয়েত বেসকে এন. পি. (নর্থ পোল) বলা হয়, প্রত্যেকটিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয় এন. পি.-র শেষে একটা করে সংখ্যা জুড়ে দিয়ে। অনেক সময় দেখা যায় বেস বা বেসগুলো হয়তো নর্থ পোল থেকে একশো মাইল দূরে রয়েছে, প্রতি মুহূর্তে ভেসে যাচ্ছে আরও দূরে।

‘সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স নেই, আভাসই বা দিই কিভাবে? প্লেন ভর্তি একদল লোক পাঠিয়ে দেব, সে উপায়ও নেই, রাশিয়ানরা তাতে সতর্ক হয়ে যেতে পারে। ওরা যদি ওদের বেস সীল করে দেয়, তখন? ইভেনকো আর বেরুতে পারবে? কাজেই আই.আই. ফাইভের পরিবেশ শান্ত আর স্বাভাবিক রাখতে হবে।’

‘মোট কথা ইভেনকো শর্ত দিয়েছে, কাজেই কাজটা রানাকে দিয়ে না করিয়ে আমাদের উপায় নেই, এই তো?’

টমাসের চোখে চোখ রেখে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন জেনারেল ফচ। ‘আরও কারণ আছে।’

‘কি কারণ?’

‘কুয়াশা।’

‘কুয়াশা?’

‘ধরো আই. আই. ফাইভ কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল? ইভেনকোকে আনার জন্যে আমাদের লোক তাহলে এখানে পৌঁছুবে কিভাবে? নিরেট পোলার প্যাকে জাহাজ চলবে না। কুয়াশার ভেতর প্লেন চালানো সম্ভব নয়। কাজেই পায়ে হেঁটে বা স্লেজে চড়ে যেতে হবে। রানাকে দিয়ে কাজটা করাবার পিছনে এটাও একটা কারণ।’

‘কেন, রানা কি?’

‘বরফের রাজ্যে রানাকে গ্যারান্টীড ইন্সুরেন্স বলতে পারো,’ ভারী গলায় বললেন জেনারেল ফচ। ‘সব মানুষই যে-কোন পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কিন্তু তার রকম ফের আছে। আর্কটিকে গিয়ে বেশিরভাগ মানুষ তাদের স্বাভাবিক গুণগুলো হারিয়ে ফেলে। আমার কথাই ধরো, ঠাণ্ডাকে

আমার বড় ভয়, আর্কটিকে গেলে জড় পদার্থ বনে যাব, ব্রেন কাজ করবে না। কিন্তু রানার বৈশিষ্ট্য হলো, আবহাওয়া আর পরিবেশ যত বিরূপ হবে ওর স্বাভাবিক গুণগুলো ততই বেশি করে ফুটবে।'

মুখ হাঁড়ি করে টমাস বলল, 'আপনি এমন করে বলছেন যেন ও একটা সুপারম্যান...'

'অথচ তুমি জানো, কারও প্রশংসা করা আমার স্বভাব নয়।' পিরিচ থেকে খোসা ছাড়ানো এক কোষ রসুন তুলে মুখে পুরলেন জেনারেল ফচ। 'নির্জলা বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করছি, কিছু বাড়িয়ে বলছি না। এর আগে একাধিক বার আর্কটিকে গেছে রানা, প্রমাণ করেছে...'

বসের কথা কেড়ে নিয়ে টমাস বলল, 'প্রমাণ করেছে যে সে সি. আই.এ-র সাথে বেঈমানী করতে ওস্তাদ।' তার চেহারা কঠোর হয়ে উঠল। 'যাই বলুন, স্যার, জেনেশুনে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি আমরা। এর আগেও ঠিক এ-ধরনের কাজের দায়িত্ব রানাকে দেয়া হয়েছিল, সেবার রাশিয়ান বিজ্ঞানীকে আমাদের হাতে তুলে না দিয়ে যুগোস্লাভিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছিল সে। এবারও যে সে...'

জেনারেল ফচ মুচকি হাসলেন। 'বেঈমানী করার সুযোগ এবার আমরা রানাকে দিচ্ছি না, টমাস। ওর যারা প্রিয় লোকজন, তাদের কয়েকজনকে আমরা জিম্মি রাখছি। এদিকে এসো, কাজটার জন্যে শুধু এক রানাকেই কেন উপযুক্ত বলে মনে করছি, ব্যাখ্যা করে বলি।' চেয়ার ছেড়ে আর্কটিক ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। থমথমে চেহারা নিয়ে তাঁর পাশে চলে এল টমাস।

ম্যাপের মাথার দিকে রাশিয়ান উপকূল, ডান দিকে মারমানস্ক

আর লেনিনগ্রাদ। মাঝখানে স্পিটবার্জেন আর গ্রীনল্যান্ড সহ নর্থ পোল, নিচে কানাডিয়ান আর আলাস্কান উপকূল। মার্কার চিহ্নিত করছে আই. আই. ফাইভের বর্তমান পজিশন, ম্যাপের খুবই নিচের দিকে সেটা, আইসবার্গ অ্যালি-র ঠিক ওপরে গাঁথা, গ্রীনল্যান্ড আর স্পিটবার্জেনের মাঝখানে জাহাজের চিমনি আকৃতির ভাসমান বিশাল বরফ খণ্ড।

'আই. আই. ফাইভ* এখন গ্রীনল্যান্ড উপকূলের একশো বিশ মাইল দূর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে,' জেনারেল ফচ মৃদু গলায় বললেন। 'আরও পঁচিশ মাইল পুবে রয়েছে রাশিয়ান বেস, এন.পি.সেভেনটিন, ওখান থেকে যাত্রা শুরু করবে ইভেনকো রুস্তভ। দুটো বেসই বিশাল দুই বরফের টুকরোর ওপর রয়েছে, টুকরো দুটো পোলার প্যাকের সাথে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে আইসবার্গ অ্যালির দিকে। শেষবার নর্থ পোল থেকে ফিরে আসার পর রানা আর্কটিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে যে রিপোর্ট করেছিল তাতে লিখেছে, দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা ওটা। ওর সাথে আমি একমত।'

'আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন…'

'গোটা এলাকাটা রানা চেনে, গেছে, এবং বেঁচেবর্তে ফিরে এসেছে,' ধমকের সুরে বললেন জেনারেল ফচ। 'কি বলতে চাইছি

---

* বিশাল আকৃতির বরফ-দ্বীপগুলো আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্যে আইস আইল্যান্ড ওয়ান, টু, থ্রী, এইভাবে উল্লেখ করে আমেরিকানরা। আই. আই. ওয়ান (আইস আইল্যান্ড ওয়ান), সবচেয়ে পুরানো বরফ-দ্বীপ, উনিশশো ছেচল্লিশ সালের চোদ্দই আগস্ট কানাডিয়ান আর্কটিক উপকূলের কাছাকাছি প্রথমবার একটা সুপারফোর্ট্রেসের রাডার অপারেটরের চোখে ধরা পড়ে।

এখনও বুঝতে পারছ না?'

'হুঁ,' বলে উদাস চোখে ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থাকল টমাস।

জেনারেল ফচ তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'থিউল-এ আমাদের সিকিউরিটি লিক সম্পর্কে কিছু শুনেছ?'

ঝট করে বসের দিকে ফিরল টমাস। 'না! কি ব্যাপার?'

'এফ.বি.আই-র মরিসন দু'ঘণ্টা আগে সাবধান করে দিয়েছে আমাকে।' রসুনের কোষে কামড় দিয়ে মুখ বাঁকালেন জেনারেল ফচ। 'জানা গেছে, টপ একজন সোভিয়েত স্পেশ্যাল সিকিউরিটি এজেন্ট দু'বছর ধরে ওখান থেকে লেনিনগ্রাদে ইনফরমেশন পাচার করছে। এফ. বি. আই. তার কোড নেম জানতে পেরেছে—কাঁকড়া। ওরা নাকি তার আসল পরিচয় খুব তাড়াতাড়ি জেনে ফেলতে পারবে।'

টমাসের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। 'এর ফলে গোটা অপারেশনটাই কেঁচে যেতে পারে।'

'আমার তা মনে হয় না,' বললেন জেনারেল। 'রানাকে সাবধান করে দেব, ও যেন শুধু ওখানকার সিকিউরিটি চীফ মাইকেল জনসনের সাথে ডিল করে।' হাতঘড়ি দেখলেন তিনি। 'যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে রানা। প্রজেক্টর অপারেটরকে ফোন করো, সে যেন ফিল্ম নিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। মিলারকেও বলো, সে তার সরঞ্জাম রেডি করুক। আমাদের হাতে সময় খুব কম।'

সামান্য একটু বিস্মিত দেখাল টমাসকে। 'আপনি বলতে চাইছেন ফিল্ম দেখার পরও রানা গোয়ার্তুমি করবে? টরচার না করলে রাজি হবে না?'

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন জেনারেল ফচ, 'হ্যাঁ, আমি ঠিক তাই

বলতে চাইছি।’

চাঁদের হিম আলোয় চকচক করছে বরফের রাজ্য। আকাশে ছড়ানো ঝলমলে গ্রেট বিয়ার নক্ষত্রপুঞ্জ ঝুলে রয়েছে পোলার প্যাকের ওপর। বাঘের মত ভয় ধরানো শীত, দীর্ঘ রজনী, আই.আই. ফাইভ অবরুদ্ধ হয়ে আছে।

গ্রীনল্যান্ড উপকূল থেকে একশো বিশ মাইল পুবে, সোভিয়েত আইস আইল্যান্ড এন.পি.সেভেনটিন থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল পশ্চিমে, বিশাল বরফ-রাজ্য পোলার প্যাক অবরুদ্ধ করে রেখেছে আই. আই. ফাইভকে। অযুত কোটি টন বরফ থেমে নেই, প্রতি মুহূর্তে ভেসে চলেছে। বিস্তীর্ণ বরফ রাজ্যে আই. আই. ফাইভ একটা বরফ দ্বীপ। অনবরত ঘষা, চাপ, আর ধাক্কা দিয়ে দ্বীপটাকে ভাঙার চেষ্টা করছে পোলার প্যাক।

দ্বীপটাকে ভাঙার এই চেষ্টা ত্রিশ বছর ধরে চলছে, সেই উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল থেকে, যেদিন কানাডিয়ান আইস শেলফ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নর্থ পোলকে ঘিরে চক্কর দেয়া শুরু করল আই.আই. ফাইভ। কিন্তু চিমনির আকৃতি নিয়ে বিশ ফুট উঁচু বরফ-দ্বীপের তেমন কোন ক্ষতিই করতে পারেনি পোলার প্যাক, কারণ পোলার প্যাক লোনা পানির বরফ—সাগরের পানি থেকে তৈরি। বিশাল বরফ রাজ্য পোলার প্যাকের চেয়ে এই নিরেট দ্বীপ অনেক বেশি শক্ত, যদিও ডায়ামিটার মাত্র এক মাইল।

আই.আই. ফাইভ মিষ্টি পানির তৈরি বরফ। তুলনায় লোনা পানির তৈরি বরফ অনেক নরম আর ভঙ্গুর হয়। তাছাড়া, আই.আই. ফাইভের বংশ-পরিচয়টাও তো দেখতে হবে। শত শত

বছর ধরে সরু গিরিখাদ থেকে নেমে আসা মন্থরগতি হিমবাহগুলো কানাডিয়ান উপকূলের কিনারায় জমাট সাগরে পড়েছে, তৈরি হয়েছে আইস শেলফ। স্তরের ওপর স্তর পড়ে দুশো ফিট গভীর হয়েছে শেলফ। আই.আই. ফাইভ এই শেলফেরই একটা টুকরো মাত্র–এক মাইল চওড়া একটা টুকরো, নিজেকে ছাড়িয়ে আলাদা করে নিয়ে ত্রিশ বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভাসমান পোলার প্যাকের সাথে।

পোলকে ঘিরে দশ বছর মেয়াদী চতুর্থ টহল শুরু করেছে আই. আই. ফাইভ, আবার একবার ঘুরে চলে এল কানাডিয়ান আর্কটিক কোস্টে, আর ঠিক তখনই গ্রীনল্যান্ড কারেন্ট পেয়ে বসল ওটাকে। বরফের প্রকাণ্ড টুকরোটাকে অনেক দক্ষিণে টেনে আনা হলো, এত দক্ষিণে এর আগে কখনও আসেনি। গ্রীনল্যান্ড আর স্পিটবার্জেনের মাঝখানে, হাজার মাইল বিস্তীর্ণ আই-ফিল্ডের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওটা, এরপর আর ফেরার পথ থাকল না। পশ্চিমের বদলে পুব দিকে এগোল আই.আই. ফাইভ, আইসবার্গ অ্যালির দিকে।

বহুদূর ওয়াশিংটনে জেনারেল ফচ তখনও রানার জন্যে অপেক্ষা করছেন, হাতে সেক্সট্যান্ট নিয়ে হেডকোয়ার্টারের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আই. আই. ফাইভের স্টেশন লীডার ড. লিমুয়েল কর্ডন, মাপজোক করে তারাগুলোর অবস্থান আরেকবার জেনে নেবেন। পঞ্চান্ন বছর বয়স কর্ডনের, শান্ত স্বভাবের মানুষ। কিন্তু যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার সময় এই মুহূর্তে তাঁকে অস্থির দেখাল। পিছনে দরজা খোলার আওয়াজ হতে তাঁর অস্থিরতা বাড়ল বৈ

কমল না।

বত্রিশ বছর বয়স, জেমস কাজম্যান স্টেশনের অয়্যারলেস অপারেটর। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে ড. কর্ডনের পাশে এসে দাঁড়াল সে। 'ব্যস্ততার কোন আভাস পাচ্ছ নাকি, ডক্টর?'

'প্রচুর,' জোর করে কৌতুক করলেন ড. কর্ডন। 'গান গাইতে গাইতে বাস ভর্তি একদল লোক গেল, পিকনিক পার্টি।'

'ঈশ্বর,' আকাশে চোখ তুলল জেমস কাজম্যান। 'যদি সত্যি হত! জানতে চাইছিলাম, রাশিয়ানদের কোন তৎপরতা...'

'না।'

বরফ-দ্বীপ আই. আই. ফাইভের মাঝখানে বারোটা সমতল ছাদঅলা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। এই বারোটা ঘর নিয়েই ওদের রিসার্চ বেস। উঁচু-নিচু বরফ মোড়া সরু একটা রাস্তার দু'পাশে দুই সারিতে ছ'টা করে বারোটা ঘর। রাস্তার শেষ মাথায় আরও একটা ঘর রয়েছে, সেটার ছাদ ফুঁড়ে চাঁদের দিকে কয়েকশো ফিট উঠে গেছে অয়্যারলেস মাস্ট। ওদের চারদিকে রয়েছে ভয়াবহ শত্রু—পোলার প্যাক। যেন বিশাল কোন আহত পশু তীব্র ব্যথায় গোঙাচ্ছে। এই গোঙানির শব্দ ওদেরকে বারবার মনে করিয়ে দেয়, পোলার প্যাক জ্যান্ত, প্রতি মুহূর্তে দ্বীপের উঁচু পাঁচিলটাকে পিষে গুঁড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। নতুন একটা আওয়াজ পেল ওরা, কড়াৎ করে বাজ পড়ল যেন।

'ওটা কি?' ফিসফিস করে জানতে চাইল কাজম্যান।

'ভেঙে আলাদা হলো বরফের একটা টুকরো,' ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললেন ড. কর্ডন। 'ভেতরে গিয়ে রডেনবার্গের সাথে থাকো, জেমস। কাজটা আমি শেষ করতে চাই।'

‘পাগলা কুত্তা হয়ে আছে রডেনবার্গ। ভয় হয়, ডক্টর, ও না আত্মহত্যা করে!’

‘সেজন্যেই তো ওর সাথে থাকতে বলছি তোমাকে,’ বললেন ড. কর্ডন। নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলেও, তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে থাকল। ওদের তিনজনের মধ্যে রডেনবার্গ সবচেয়ে ছোট, মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়েস। বরফের এই নির্জন জগৎ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে তাকে, যে-কোন মুহূর্তে নার্ভাস ব্রেকডাউন ঘটতে পারে। এই দ্বীপে ওদের দিন যতই ফুরিয়ে আসছে ততই বাড়ছে তার রোগের উপসর্গ। আর বারো দিন পর ওদেরকে নিতে আসবে প্লেন, এই অভিশপ্ত দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবে ওরা, যেন সেজন্যেই এখন প্রতিটি ঘণ্টাকে, এমনকি প্রতিটি মুহূর্তকে মনে হচ্ছে এক একটা বছর।

ওদের এই সার্চ বেসকে তিন দিক থেকে ঘিরে আছে মসৃণ তুষার মোড়া মালভূমি, দ্বীপ-পাঁচিলের উঁচু কিনারা পর্যন্ত তার বিস্তার–বাকি একদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে ছোট একটা পাথুরে পাহাড়, মালভূমি থেকে চল্লিশ ফিট উঁচু তার চূড়া। এখানে, সবচেয়ে কাছের উপকূল থেকে একশো মাইল দূরে, এই পাহাড়ের গায়ে গিজ গিজ করছে বিশাল আকৃতির বরফ মোড়া বোল্ডার, সত্যিকার নিরেট পাথর, কোন কোনটা আকারে ছোটখাট বাড়ির মত। বহু যুগ আগে হিমবাহের সাথে কানাডিয়ান আইস শেলফে নেমে এসেছিল ওগুলো, এবং এক সময় যখন বরফের একটা টুকরো দ্বীপের আকৃতি নিয়ে শেলফ থেকে আলাদা হয়ে যায়, টুকরোর সাথে বেরিয়ে আসে ওই পাথুরে পাহাড়।

একটা ঘরের দিকে এগোল কাজম্যান, দরজা খুলে বেরিয়ে

এল রডেনবার্গ। আওয়াজ পেয়ে ড. কর্ডনের মুখভাব থমথমে হয়ে উঠল। কাজম্যান ঘরে না ঢুকে রডেনবার্গের সাথে ফিরে এল ড. কর্ডন যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেখানে।

রডেনবার্গ যে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বরফের রাজ্যে এ এক ধরনের নির্বাসন, গরম ঘরের ভেতরও একা কেউ থাকতে চায় না। কিন্তু পোলার প্যাক যেমন প্রতি মুহূর্তে দ্বীপের পাঁচিলে কামড় বসাচ্ছে, ওরা তিনজন একসাথে হলেও দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেমনি পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে।

'দরজাটা বন্ধ করেছ, গুন্টার?' একটা ইন্সট্রুমেন্টে চোখ চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলেন ড. কর্ডন। তাঁর পিছনে দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ হলো।

'রাশিয়ানরা চলে গেছে!' হাউমাউ করে উঠল রডেনবার্গ, মনে হলো কেঁদে ফেলবে। 'ঘটে বুদ্ধি রাখে ওরা, সময় থাকতে নিজেদের বেস ছেড়ে কেটে পড়েছে। অয়্যারলেস করে আমরা কেন আমাদের প্লেনটাকে ডাকছি না? সবই তো প্যাক করা হয়ে গেছে...'

'থামো, গুন্টার,' সেক্সট্যান্ট নামিয়ে দ্রুত আধপাক ঘুরলেন ড. কর্ডন। 'সব প্যাক করা হয়নি। তাছাড়া, এখনও সব এক্সপেরিমেন্ট শেষ করোনি তুমি...'

'লাথি মারি এক্সপেরিমেন্টে!' ফুঁসে উঠল রডেনবার্গ। 'এই জায়গায় আর একটা দিন থাকতে হলে আমি মারা যাব...'

'আই.আই. ফাইভে আজ এগারো মাস রয়েছ তুমি,' বাধা দিয়ে বললেন ড. কর্ডন। 'এটা তো সেই একই জায়গা।'

‘এসব ছেলে-ভুলানো কথা শুনতে চাই না,’ রাগের সাথে বলল রডেনবার্গ। ‘আইসবার্গ অ্যালির কিনারায় চলে এসেছি আমরা, একই জায়গা হলো কি করে?’

‘ভেতরে গিয়ে খানিকটা কফি বানাও,’ ধমকের সুরে বললেন ড. কর্ডন। ‘সময়টা আমরাও উপভোগ করছি না, কিন্তু তাই বলে অস্থির হয়ে কোন লাভ নেই।’ নরম তুষারের ওপর থপ থপ পা ফেলে ঘরে ঢুকল রডেনবার্গ, দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ হলো আবার। ‘ওর সাথে থাকো, জেমস,’ নরম সুরে বললেন তিনি। ‘একা কি না কি করে বসে। ও শান্ত হলে আবার তুমি একবার থিউল-এর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা কোরো। আমাদের নতুন পজিশন ওদেরকে জানানো দরকার।’

‘চেষ্টা করতে আপত্তি নেই,’ সন্দিহান দেখাল কাজম্যানকে। ‘অত্যন্ত বাজে ধরনের স্ট্যাটিক বিল্ড করছে। আমার ধারণা, বাইরের দুনিয়ার সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হতে পারে আবহাওয়ার বিরাট কোন পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে।’

কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছেন ড. কর্ডন, নিজের অজান্তেই ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে তাঁর। রেডিও যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটছে, বা একেবারেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না, এ-ধরনের কথা শোনার পর কারও পক্ষেই স্থির থাকা সম্ভব নয়। কাজ শেষ করে যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিলেন তিনি, ঘরে ঢোকার আগে পরিচিত জমাট সাগর আর প্রাণহীন নির্জন শীতল বিস্তৃতির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। কোত্থেকে একটা ভয় এসে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল তাঁকে, গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল। কপালে কি দেশে ফেরা আছে? নাকি এই বরফ-দ্বীপেই লেখা আছে শীতল মৃত্যু?

সি.আই.এ-র অপারেশনাল হেড অফিসে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হলো রানাকে। জেনারেল ফচকে কোথাও দেখা গেল না, তাঁর সহকারী টমাস উড পথ দেখিয়ে একটা ছোট ঘরে নিয়ে এল ওকে। অপারেটর আগে থেকেই তৈরি ছিল, ওরা ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে সব আলো নিভিয়ে দিল সে। ইতিমধ্যে একটা চেয়ারে বসেছে রানা, ওর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে টমাস উড। প্রজেক্টর চালু হলো, সামনের সাদা স্ক্রীনে ফুটে উঠল রঙিন ছবি।

গ্রীনল্যান্ড। আমেরিকান আর্কটিক রিসার্চ ল্যাবরেটরির দিকে স্থির হয়ে আছে ক্যামেরা। ল্যাবরেটরি ভবনের গেটের সামনে মার্কিন নেভীর ছাপ মারা একটা জীপ দেখা যাচ্ছে। ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসার আর একজন নৌ-সেনা জীপের পাশে দাঁড়িয়ে, ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে ওরা। মনে হলো, কেউ বেরিয়ে আসবে সেজন্যে অপেক্ষা করছে।

অশুভ কিছু আশঙ্কা করল রানা। আমেরিকান আর্কটিক রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে বাংলাদেশী দু'জন তরুণ বিজ্ঞানী কাজ করে, নিয়াজ মাহমুদ আর বিনয় মুখার্জি। কেউ তদবির করেনি, মার্কিন সরকার উপযাচক হয়ে তিন বছরের স্কলারশিপে এই ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করার সুযোগ দিয়েছে ওদেরকে। ওরা যে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির পার্টটাইম অপারেটর, কাকপক্ষীরও তা জানার কথা নয়। রুশ বা মার্কিন আর্কটিক রিসার্চ বেসগুলো আসলে এক একটা স্পাইয়ের আখড়া, চোখ-কান খোলা রাখলে গবেষকরা অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পারে। নিয়াজ আর বিনয়

দু'জনেই হঠাৎ পাওয়া কোন তথ্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে গোপনে পাঠিয়ে দেয় রানা এজেন্সির হেডকোয়ার্টারে।

নিয়াজ মাহমুদ দক্ষ নেভিগেটর, মেরিন বায়োলজিতে মাস্টার ডিগ্রী আছে তার, প্রথম শ্রেণীর মার্কসম্যান। সুদর্শন, প্রাণচঞ্চল, কৌতুকপ্রিয় নিয়াজ প্রেমে বিফল হওয়ার পর জীবনে কখনও বিয়ে করবে না বলে ঘোষণা করে দিয়েছে।

বিনয় মুখার্জি পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি লম্বা, প্রতিভাবান জিয়োলজিস্ট, বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ, ডেপথ-সাউন্ডিং বিষয়ে ভাল কারিগরি জ্ঞান রাখে। নিয়াজ তার একমাত্র বন্ধু, এবং ওরা তিনজন সমবয়েসী হলেও রানা বলতে দু'জনেই অজ্ঞান। রানার সাথে ওদের সম্পর্ক ঠিক গুরু-শিষ্যের নয়, আবার বন্ধুত্বেরও নয়। রানাকে ওরা নাম ধরেই ডাকে, তুমি বলে সম্বোধন করে, কিন্তু ব্যবহারে লুকিয়ে থাকে শ্রদ্ধা আর সমীহের ভাব, সেটা অনেক সময়ই কারও চোখে পড়ে না। বছর চারেক আগে মাত্র একবার রানার সাথে একটা অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করেছে ওরা। তবে গ্রীনল্যান্ডে ওদের সাথে দু'একবার দেখা হয়েছে রানার।

ল্যাবরেটরির খোলা গেট দিয়ে বেরিয়ে এল নিয়াজ আর বিনয়, ওদের সামনে পিছনে একজন করে ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র নৌ-সেনা। জুম করে এগোল ক্যামেরা, স্ক্রীনে বড় আকারে ফুটল ওদের দু'জনের চেহারা। কৌতুকপ্রিয় নিয়াজের মুখে হাসি নেই, বিনয়ের চোখ দুটো বিষণ্ণ। রানা বুঝল, ওর আশঙ্কাই সত্যি হতে যাচ্ছে। সম্ভবত কোন গোপন তথ্য যোগাড় করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে ওরা।

অফিসারের সামনে দাঁড়াল ওরা। অফিসার পকেট থেকে

একটা কাগজ বের করে পড়ল, 'গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে আপনাদের গ্রেফতার করা হলো।' একজন নৌ-সেনার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল সে, লোকটা এগিয়ে এসে নিয়াজ আর বিনয়ের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। জীপে তোলা হলো ওদের, দ্রুত একটা ইউটার্ন নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়ি।

আলো জ্বলে ওঠার অপেক্ষায় না থেকে চেয়ার ছাড়তে গেল রানা, পিছন থেকে ওর কাঁধে একটা হাত রাখল টমাস উড। 'আরও আছে, মি. মাসুদ রানা।'

অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল রানার মনে, কিন্তু শক্ত কাঠ হয়ে চুপচাপ বসে থাকল ও। ওদের গ্রেপ্তারের ঘটনা ওকে ডেকে আনিয়ে দেখাবার পিছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। তার চেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপার হলো, আর কি দেখতে হবে ওকে?

আবার সচল ছবি ফুটল স্ক্রীনে। এবার যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো রাজ্যের দৃশ্য ফুটে উঠল। একটা গাড়ির ওপর রয়েছে ক্যামেরা, গাড়ি ছুটে চলেছে বড় একটা রাস্তা ধরে। বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল ওর। পিছনে দাঁড়িয়ে মুচকি একটু হাসল টমাস উড। আবছা অন্ধকারেও রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছে সে।

সোহানার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রানা। পর পর দুটো অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে সোহানা, কলোরাডোর সিটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে তাকে। বিশ্রাম আর উপযুক্ত চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সেরে উঠছে সে। দিন সাতেক আগে তাকে দেখেও এসেছে রানা।

সি.আই.এ. তবে কি সোহানাকেও...?

চোয়াল দুটো শক্ত, উঁচু হয়ে উঠল রানার।

যা আশঙ্কা করেছিল, সিটি ক্লিনিকের সামনে থামল ক্যামেরা। ক্লিনিকের গেটে কোন গাড়ি দেখা গেল না, তবে পনেরো বিশ গজ পর পর দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকজন ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র পুলিস। খোলা গেট দিয়ে ক্লিনিকের ভেতর ঢুকল ক্যামেরা। একটা কেবিনের দরজা দেখা গেল, দরজার বাইরে একজন পুলিস। পরমুহূর্তে কেবিনের ভেতরে দৃশ্য ফুটে উঠল। বিছানায় শুয়ে একটা ভোগ ম্যাগাজিন পড়ছে সোহানা। ম্লান চেহারা, চোখে বিষণ্ন দৃষ্টি। দেয়াল ঘেঁষে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে ইউনিফর্ম পরা একটা মহিলা পুলিস। সোহানার দিকে তাক করা নয় বটে, কিন্তু তার কোলের ওপর হাতে ধরা একটা পিস্তল দেখা যাচ্ছে।

সম্ভবত ডাক্তারদের অনুমতি পাওয়া যায়নি বলে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়নি সোহানাকে। আপাতত নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে, সুস্থ হয়ে উঠলেই হাজতে নিয়ে ভরা হবে।

ওকে নিশ্চয়ই গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে...দাঁতে দাঁত চাপল রানা।

খুট্ শব্দের সাথে যখন আলো জ্বলল, টমাস উড দেখল উঠে দাঁড়িয়ে ট্রাউজারের বোতাম লাগাচ্ছে রানা। মেঝের দিকে উঠে তাকাল সে, পানির স্রোত দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। 'মি. রানা, আপনি, মানে...'

'ভয় পেলে এরকম হয় আমার,' বলে টমাসের মুখের ওপর হাসল রানা। পরমুহূর্তে গম্ভীর হলো। 'তোমার বসের কাছে নিয়ে চলো আমাকে।'

কালচে তিলে ভরা টমাসের লাল মুখ আরও লাল হয়ে উঠল

রাগে। রানার এ এক ধরনের পাল্টা আক্রমণ, বুঝতে পেরেছে। শুধু রাগ নয়, স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে সে–কোন লোক এত দ্রুত রিয়্যাক্ট করতে পারে তার ধারণা ছিল না।

টমাস চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে তার দিকে এক পা এগোল রানা। 'আমার কথা শুনতে পাওনি?'

প্রায় লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল টমাস, শোল্ডার হোলস্টার থেকে চোখের পলকে বেরিয়ে এল একটা ইস্পাত-নীল রিভলভার। 'সাবধান!'

হাঁ করে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অপারেটর।

'হাত দুটো সামনে রেখে চেয়ারে বসুন, মি. রানা,' বলল টমাস, তার রিভলভারের কালো মাজ্‌ল্‌ রানার বুকের দিকে তাক করা। 'আমার বস্‌, জেনারেল ফচ, আর্কটিক জোনের অপারেশনাল চীফ, জরুরী কাজে বাইরে আছেন। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আমার ওপর দেয়া হয়েছে।'

বসল না রানা, হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে টান টান হয়ে দাঁড়াল। 'বিপদে পড়েছ, আমার সাহায্য দরকার–আগেই বুঝেছি।'

দরজার দিকে সরে গেল টমাস, সুইচবোর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে শুরু করল, 'প্রথম শ্রেণীর একজন রুশ ওশেনোগ্রাফার, ইভেনকো রুস্তভ আমেরিকায় পালিয়ে আসতে চেয়েছেন। আর্কটিকে, একটা সোভিয়েত বেসে রয়েছেন তিনি, শর্ত দিয়েছেন শুধু মাসুদ রানাকে পাঠালে তবেই তিনি আসবেন...'

'ওদের তোমরা...'

'ওদের আমরা ইন্সুরেন্স হিসেবে আটকে রাখব,' বলল টমাস। 'এর আগেও একজন রুশ বিজ্ঞানীকে নিয়ে আসার দায়িত্ব

আপনাকে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তাকে আপনি সোভিয়েত এলাকা থেকে নিয়ে এলেও, আমাদের হাতে তুলে না দিয়ে যুগোস্লাভিয়ায় পাঠিয়ে দেন। সেজন্যেই এবার আমরা সাবধান হয়ে গেছি। ইভেনকো রুস্তভকে আপনি নিরাপদে আমাদের হাতে তুলে দিলেই ওরা তিনজন ছাড়া পেয়ে যাবে, অর্থাৎ ওদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে।'

'আমি যদি কাজটা না করি?'

কাঁধ ঝাঁকাল টমাস। 'সেক্ষেত্রে আইন তার নিজস্ব পথে এগোবে। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ প্রমাণ হলে দুটোর যে-কোন একটা শাস্তি ওদের কপালে ঝুলছে—হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, নাহয় মৃত্যুদণ্ড। আমি দুঃখিত, মি. রানা—কাজটা করা ছাড়া আপনার সামনে আর কোন বিকল্প আছে বলে তো আমার মনে হয় না...'

'আছে,' বলে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে টমাসের দিকে এগোল রানা। 'কাঁধ থেকে তোমার মুণ্ডুটা আগে ছিঁড়ে নামাই...'

টমাসের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল, সুইচবোর্ডের একটা বোতাম টিপে দিল সে। সবেগে বিস্ফোরিত হলো দরজা, হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল উদ্যত রিভলভার হাতে তিনজন সি.আই.এ. এজেন্ট।

ভেতরে ঢুকে দ্রুত পজিশন নিল ওরা। দু'জন দাঁড়াল টমাসের দু'পাশে, আরেকজন চলে গেল রানার পিছনে। রানার চোখে চোখ রেখে ক্ষীণ একটু হাসল টমাস। 'কোথায় রয়েছেন ভুলে গেলে চলবে কেন! এখানে শুধু আমরাই জোর খাটাতে পারি, বাকি সবাইকে নত হতে হয়। আপনি রাজি হয়ে যান, দেখবেন, আমরা সবাই আপনার বন্ধু হয়ে গেছি।'

পিছিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসল রানা। 'তোমার বাপদের খবর দাও; বলো, আমি রাজি নই।' ভাবল, কি মনে করে ওরা, ব্ল্যাকমেইলিঙের কাছে নতি স্বীকার করব?

'প্লীজ, মি. রানা, আরেকবার ভেবে দেখুন,' বলল টমাস। 'নিয়াজ আর বিনয়ের এই বিপদের জন্যে আপনিও কোন অংশে কম দায়ী নন। আপনার নির্দেশেই ওরা গোপন তথ্য সংগ্রহ করছিল। তারপর ধরুন মিস সোহানার কথা। আপনার ওপর তার দুর্বলতার কথা কে না জানে। নিশ্চয়ই আপনি চান না এদের জীবন ধ্বংস হয়ে যাক?'

'ওদের কিভাবে মুক্ত করতে হবে আমার জানা আছে,' বলল রানা। জানে, ও যদি রানা এজেন্সির অপারেটরদের নির্দেশ দেয়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ-সাতজন সি.আই.এ. এজেন্টকে পাল্টা আটক করতে পারবে তারা। 'বন্দি বিনিময়ের প্রস্তাবটা তোমরাই আগে দেবে।'

'সি.আই.এ. এজেন্টদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে, তাদের কেউ আটক করতে পারবে না। তাছাড়া, নিজের লোককে আপনি নির্দেশ দেবেন কিভাবে? আপনাকে আমরা ছাড়লে তো!'

রানা জানে, এরই মধ্যে রানা এজেন্সি এবং বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স নিয়াজ, বিনয়, আর সোহানার গ্রেফতার হওয়ার খবর পেয়ে গেছে। বিশেষ করে এজেন্সির অপারেটররা রানার নির্দেশ পাবার জন্যে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে রানা যোগাযোগ না করলে কি ঘটেছে বুঝে নেবে ওরা, তার পরই পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে কাজে হাত দেবে। ওরা যদি সি.আই.এ. এজেন্টদের নাগাল না পায়, একমাত্র উপায়

হিসেবে সোহানা, নিয়াজ, আর বিনয়কে ছিনিয়ে আনার চেষ্টায় কমান্ডো হামলা চালাবে, এবং মারা পড়বে অকাতরে।

'হ্যাঁ,' মুচকি হেসে আবার বলল টমাস, 'আপনি যা ভাবছেন আমিও তাই ভাবছি। প্রচুর রক্তপাত ঘটবে। দু'পক্ষেরই। আপনি কি সেটা চান?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'আমি বন্দি, কাজেই যাই ঘটুক না কেন আমাকে দায়ী করা যাবে না।'

'কিন্তু আপনাকে রাজি করাতে না পারলে আমাকে দায়ী করা হবে,' গম্ভীর সুরে বলল টমাস। 'কারণটা কি, কেন আপনি গোঁ ধরছেন?'

'নীতির প্রশ্ন,' বলল রানা। 'নিরপেক্ষ থাকতে চাই আমরা। কখনও যদি রাশিয়ার বা আমেরিকার বিরুদ্ধে কিছু করি, শুধু ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যেই তা করব। তাছাড়া, আত্মসম্মানবোধ আমাদের একটু বেশি, চাপের মুখে মাথা নোয়াই না।'

রানার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চেহারা দেখে যা বোঝার বুঝে নিল টমাস। 'ঘি যখন উঠলই না, আঙুল আমাকে বাঁকা করতেই হয়!' তার ইঙ্গিতে তিনজন তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলল রানাকে। 'আন্ডারগ্রাউন্ড সেলে নিয়ে যাও ওকে। টরচারের ফুল কোর্স শেষ করে তারপর রিপোর্ট করবে আমার কাছে।'

চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও মনে মনে আঁতকে উঠল রানা। সি.আই.এ-র নির্যাতন কি জিনিস জানা আছে ওর, নাৎসীরা থাকলে তারাও লজ্জা পেত। ফুল কোর্স মানে বারো ঘণ্টা মেয়াদে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার, বেশিরভাগ

লোক ছ'ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়। বারো ঘণ্টার নির্যাতন সহ্য করে কেউ যদি বেঁচে থাকে, পঙ্গু এবং উন্মাদ অবস্থায় বাকি জীবন কাটে তার।

করিডরে আরও দু'জন সশস্ত্র এজেন্ট ওদের সাথে যোগ দিল। সিঁড়ি বেয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড সেলে নামার সময় রানার মাথার ভেতর ঝড় বয়ে গেল। জানে বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'একজনকে আহত করা সম্ভব, এক-আধজনকে হয়তো মেরেও ফেলা যায়, কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন হয়তো কিছুই জানেন না, তাঁর সই সম্ভবত নকল করেছে ওরা। বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ফোন করা। ভদ্রলোকের সাথে রানার পরিচয় আছে, সি.আই.এ-র এই ভূমিকা সম্পর্কে জানলে নিশ্চয়ই খেপে উঠবেন।

এত কথা ভাবল রানা, কিন্তু একবারও ওদের প্রস্তাব মেনে নেয়ার কথা বিবেচনা করল না। ক্ষীণ একটু স্বস্তি বোধ করছে ও, নর্থ পোলে ওকে পাঠানো যদি খুব জরুরী হয় তাহলে নির্যাতনের একটা সীমা থাকবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করবে ওরা, সে রাজি হবে যেতে।

লোহার একটা বেডে শোয়ানো হলো রানাকে, কয়েক জোড়া স্ট্র্যাপ দিয়ে এমনভাবে বাঁধা হলো হাত-পা, এক চুল নড়ার উপায় থাকল না। সেল থেকে বিদায় নিল টমাস, যাবার সময় সম্পূর্ণ হতাশ করে দিয়ে গেল রানাকে। 'আপনি আমাদের কোন কাজে আসবেন না এটা ধরে নিয়েই টরচার চালানো হবে, মি. রানা,' নির্দয় সুরে বলল সে। 'আপনার নাম-পরিচয় নিয়ে অন্য লোক

যাবে নর্থ পোলে।’

টেপ দিয়ে রানার চোখের পাপড়িসহ পাতা জোড়া ভুরুর সাথে আটকে দেয়া হলো, ফলে চেষ্টা করলেও চোখ বন্ধ করা সম্ভব নয়। তার টেনে নামানো হলো ওর চোখের সামনে, শেষ প্রান্তে ঝুলছে দুশো পাওয়ারের নগ্ন একটা বালব। সিলিং থেকে ঝুলছে একটা সরু পাইপ, পাইপের মুখ থেকে হিম শীতল ঠাণ্ডা পানির ফোঁটা পড়তে শুরু করল রানার কপালের ঠিক মাঝখানে। বালবটা আগেই জ্বেলে দেয়া হয়েছে।

তিন মিনিট সহ্য করল রানা, তারপর গোটা ব্যাপারটা সহ্যের বাইরে চলে গেল। পানির ফোঁটাগুলো ঠাণ্ডা বোমার মত বিস্ফোরিত হলো কপালে। প্রতি দু'সেকেন্ডে একটা করে শীতল ফোঁটা। সময়ের সাথে তাল দিয়ে একই ছন্দে জ্বলতে আর নিভতে লাগল বালবটা। রানার পায়ের কাছে বসে আছে এক লোক, দু'পায়ের তলায় পাখির পালক দিয়ে নিবিষ্ট মনে আলতো সুড়সুড়ি দিয়ে চলেছে সে।

দু'সেকেন্ড পর পর আলোর বিস্ফোরণ, কিন্তু আলোর ভেতর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা। লোকে অন্ধ হয়ে গেলে অন্ধকার দেখে, রানা অন্ধ হয়ে গিয়ে শুধু আলো দেখছে। কারও গায়ে বোমা ফাটলে তার শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, রানার গায়ে বোমাও পড়ছে না, শরীরও ছিন্নভিন্ন হচ্ছে না, কিন্তু অনুভূতিটা হচ্ছে হুবহু সেই রকম–দু'সেকেন্ড পরপর একবার করে।

দেখতে না পেলেও রানা টের পেল, ক্ষুরধার কিছু দিয়ে ওর গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হলো। নির্যাতনের পর্যায়গুলো জানা আছে ওর। ওর বুকের বোঁটায় এবার ইলেকট্রিক কাঁকড়া বসানো

হবে। কোমর থেকে ট্রাউজারও নামিয়ে ফেলা হলো। এরপর আন্ডারঅয়্যার। পেনিসের ডগায়ও থাকবে একটা কাঁকড়া।

আধ ঘণ্টার বেশি ইলেকট্রিক শক দেয়া হয় না, লোকটাকে যদি তাড়াতাড়ি মেরে ফেলার ইচ্ছে থাকে তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। শক দেয়া শুরু হলে রানার সারা শরীর প্রায় অসাড় হয়ে যাবে, কাজেই পায়ে সুড়সুড়ি দেয়ার আর কোন মানে হয় না। পানির ফোঁটা আর আলোর বিস্ফোরণ চলতেই থাকবে, তবে সেজন্যে আলাদা কোন লোকের দরকার নেই। সেলে এখন শুধু একজন লোকই রয়েছে, জন মিলার।

মানুষকে কষ্ট দিয়ে যারা পৈশাচিক আনন্দ পায়, মিলার তাদের একজন। তাকে এই মুহূর্তে রানা দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু তার সম্পর্কে গোপন অনেক কথা জানা আছে ওর। এই লোক আজরাইলের চেয়েও ভয়ঙ্কর, নির্দয় অত্যাচার চালিয়ে ধীরে ধীরে জান কবচ করে।

দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে ঝাড়া পাঁচ মিনিট সময় লাগবে রানার। একাধারে বিস্মিত এবং শঙ্কিত হয়ে উঠেছে ও। কপালে শীতল বোমা ফাটছে না, চোখে বিস্ফারিত হচ্ছে না সাদা আলো। ব্যাপারটা কি? কি ঘটতে যাচ্ছে? বুঝতে দু'মিনিট সময় লাগল, চোখের পাতা থেকে খুলে নেয়া হয়েছে টেপ। চোখ বন্ধ করতে পারছে ও। কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল হিসহিসে একটা কণ্ঠস্বর, 'আরও তিন মিনিট পর চোখ খুলবেন, মি. রানা।'

সারা শরীরে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। মাথা আর চোখে প্রচণ্ড ব্যথা, সারা শরীর ঘামছে দরদর করে। তিন মিনিট পর ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা। প্রথম কিছুই দেখল না, সব ঝাপসা,

তারপর একটু একটু করে কেটে গেল অস্পষ্ট কুয়াশা ভাব।

সিলিঙে একটা টিউবলাইট জ্বলছে। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে একটা মুখ। কোথায় যেন দেখেছে লোকটাকে।

'আমি জন মিলার,' বলল লোকটা, চেহারায় চাপা উত্তেজনা। 'আপনি আমার সম্পর্কে জানেন, দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা?'

মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার চেহারা। লোকটাকে চিনতে পেরেছে ও।

'রাজি হয়ে যান,' নিচু গলায় দ্রুত বলল জন মিলার। 'করে দিন কাজটা। আমরাও চাইছি ইভেনকো রুস্তভ এখানে চলে আসুন। আপনি শুধু তাঁকে এখানে পৌঁছে দিন—প্লীজ, মি. রানা।'

তারপর আবার যাকে তাই অবস্থা। রানা কোন প্রশ্ন বা প্রতিবাদ করার আগেই জ্যান্ত হয়ে উঠল ইলেকট্রিক কাঁকড়া, সেই সাথে বিস্ফোরিত হলো পানির ফোঁটা আর চোখ ধাঁধানো আলো।

জ্ঞান হারাবার আগে ভাবনা চিন্তার জন্যে অল্পই সময় পেল রানা। অনেক দিন থেকেই জানে ও, জন মিলার সোভিয়েত স্পাই, সি. আই. এ-র ভেতর ঠাঁই করে নিয়েছে। সি.আই. এ-র ওপর একটা মোক্ষম প্রতিশোধ নেয়ার চমৎকার সুযোগ দেখতে পেল ও। কে.জি.বি.-ও চাইছে ইভেনকো রুস্তভ আমেরিকায় চলে আসুক, তারমানে রহস্যের ভেতর রহস্য আছে। রুস্তভের কাছে হয়তো অমূল্য কোন ডকুমেন্ট আছে, সেগুলো পাবার আশায় উন্মুখ হয়ে আছে সি.আই.এ.। আর কে. জি. বি. হয়তো ভাবছে ভুয়া কাগজ-পত্র দিয়ে পাঠাবে রুস্তভকে। এক সময় ব্যাপারটা হয়তো চাপা থাকবে না, ফাঁস হয়ে যাবে, কিন্তু ততদিনে আমেরিকায় বসে মার্কিনীদের অমূল্য কিছু ডকুমেন্টে চোখ বুলাবার সুযোগ পেয়ে

যাবে রুস্তভ। ভুয়া কাগজ-পত্র গছিয়ে দিয়ে, শত্রুপক্ষের গোপন কাগজ-পত্র হাত করে, আবার ফিরে যাবে রুস্তভ। মস্ত একটা ঠক খেয়ে আঙুল চোষা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না সি. আই.এ-র। কিংবা এমনও হতে পারে রুস্তভ হয়তো কে.জি.বি.-র ভূমিকা সম্পর্কে কিছুই জানে না। তার পালিয়ে আসার ইচ্ছে সম্পর্কে কে.জি.বি. জানে, এ-সম্পর্কেও হয়তো তার কোন ধারণা নেই।

এত ব্যাপারে মাথা না ঘামালেও চলবে। নর্থ পোল থেকে ইভেনকো রুস্তভকে আমেরিকায় নিয়ে আসতে পারলে কে.জি.বি.-র একটা উপকার করা হবে, রানার জন্যে এটুকু জানাই যথেষ্ট।

জ্ঞান ফেরার পর ফিসফাস গলার আওয়াজ পেল রানা। অত্যন্ত মার্জিত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আপনি শান্ত থাকুন, মি. রানা। আপনার এই অবস্থার জন্যে যে লোক দায়ী তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আমরা সবাই অনুতপ্ত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। প্লীজ, দশ মিনিট পর চোখ খুলবেন।'

এখনও রানা নগ্ন, তবে চাদরে গা ঢাকা রয়েছে। একটা ইঞ্জেকশন দেয়া হলো ওকে, শরীরের সব ব্যথা দূর হয়ে গেল। দশ মিনিট পর চোখ মেলে দেখল, ছোট্ট একটা কেবিনে নরম, সাদা বিছানায় শুয়ে রয়েছে ও। দু'জন ডাক্তার আর একজন নার্সকে দেখা গেল, তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সি.আই.এ-র পদস্থ একজন কর্মকর্তা। লোকটাকে চিনতে পারল রানা, ডেপুটি ডিরেক্টর কর্নেল উইলিয়াম অবসন।

'খবর পাওয়া মাত্র ল্যাংলি থেকে ছুটে এসেছি আমি, মি. রানা,' ডাক্তার আর নার্সকে ঠেলে সামনে এগিয়ে এল ডি. ডি.।

তার পিছন থেকে উঁকি দিলেন আর্কটিক জোনের অপারেশনাল চীফ জেনারেল ফচ। ‘আপনার ওপর যে অন্যায় করা হয়েছে তার জন্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চাইছি। টমাস একটা গর্দভ, এর জন্যে তাকে শাস্তিও পেতে হবে। জেনারেল ফচ অফিসে ছিলেন না, থাকলে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটত না...’

বিছানার ওপর উঠে বসতে গেল রানা, তরুণী নার্স দ্রুত এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল ওকে। ‘ধীরে, স্যার, ধীরে।’ রানাকে বসিয়ে ওর পিছনে কয়েকটা বালিশ ঠেসে দিল সে। তার কোমল, উন্নত স্তন চাপ দিল রানার কপালে। ‘এক চুমুকে এটুকু খেয়ে নিন, স্যার,’ বলে রানার মুখে আধ গ্লাস ব্র্যান্ডি ধরল সে।

গ্লাসটা শেষ করে ডি. ডি. কর্নেল অবসনের দিকে তাকাল রানা। ‘এখন তাহলে আমি এখান থেকে যেতে পারি?’

হাত দুটো প্রসারিত করে কর্নেল বলল, ‘কেউ আপনাকে বাধা দেবে না। কিন্তু তার আগে আপনার যত্ন নেয়ার অনুমতিটুকু দয়া করে দিন আমাদের, প্লীজ।’ বলে ঘুরে দাঁড়াল সে, এবং তার পিছু পিছু কামরা থেকে নার্স বাদে আর সবাই নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

‘বিশ্বাস করতে একটু কষ্ট হচ্ছে,’ চোখ মটকে বলল রানা। ‘নরক থেকে সরাসরি একেবারে স্বর্গে? এ-ও এক ধরনের ট্রিটমেন্ট, তাই না?’

গোলাপী ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে নার্স বলল, ‘চুপ! কথা বলা নিষেধ।’ একটানে রানার গা থেকে চাদরটা তুলে নিল সে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত সকৌতুকে দেখল। দুষ্টুমিভরা হাসি দেখা গেল তার সারা মুখে। ‘মাই গড!’ কিন্তু বিস্ময় প্রকাশের কারণটা বলল না। রানার শরীরের তিন জায়গায় খুদে আকৃতির ক্ষত দেখা গেল,

বুকের দুটো বোঁটায় আর পেনিসের মাথায়। ক্ষতগুলো আঙুলের আলতো স্পর্শে পরখ করল সে। মৃদু হেসে বলল, 'চব্বিশ ঘণ্টা মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে, তাহলেই মেরামত হয়ে যাবে চামড়া।' গুরু নিতম্বে ঢেউ তুলে পিছন ফিরল সে। 'কাঁধ ধরে ঝুলে পড়ুন, বাথরুমে নিয়ে যাই।'

হেঁটেই বাথরুমে ঢুকল রানা। গরম পানি দিয়ে ওকে গোসল করিয়ে দিল নার্স। হ্যাঙ্গারে নতুন এক প্রস্থ কাপড়চোপড় ঝুলছে, এক এক করে রানাকে পরানো হলো। কেবিনে ফিরে মেয়েটার জেদে এক বাটি গরম মুরগির সুপও খেতে হলো ওকে। ওর মাথা আঁচড়ে দিল মেয়েটা, তারপর রানার দুই গালে আর ঠোঁটের ওপর হালকা চুমো খেয়ে গুডলাক বলল, কোমর দুলিয়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। প্রায় সাথে সাথে ভেতরে ঢুকল কর্নেল অবসন আর জেনারেল ফচ।

'এটা একটা মানবিক প্রশ্ন, মি. রানা,' কোন ভূমিকা না করেই নতুন করে প্রস্তাবটা পাড়ল কর্নেল অবসন। 'কাজটা আপনি করবেন কি করবেন না, সেটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার, কেউ আপনাকে জোর করছে না। তবে, একজন মক্কেল হিসেবে রানা এজেন্সির সার্ভিস আশা করার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে, ঠিক কিনা? কাজটা কি আপনি জানেন, কিন্তু এর পুরস্কার কি তা জানেন না। ওয়ান বিলিয়ন ডলার, মি. রানা।'

'কত বললেন?' রানার মনে হলো ভুল শুনেছে।

'এক হাজার মিলিয়ন ডলার, মি. রানা,' সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর সবিনয়ে হাসল। 'সমস্ত খরচ আমাদের। সত্যি কথা

বলতে কি, ইভেনকো রুস্তভ সাথে করে যা নিয়ে আসবে তার দামের তুলনায় এক বিলিয়ন ডলার হাতের ময়লা মাত্র। আমার শুধু একটাই অনুরোধ, মি. রানা, প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দেয়ার আগে মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভেবে দেখুন...'

এমন ভাব করল রানা যেন গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। ঝাড়া এক মিনিট পর মুখ তুলে বলল, 'আমার তিন সহকর্মীকে মুক্তি না দিলে এমনকি আমি আলোচনা করতেও রাজি নই।'

ফোনের রিসিভার তুলে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল কর্নেল অবসন, সেই সাথে রানার সামনে একটা নোটবুক খুলে ধরল। 'সরাসরি ডায়ালিং পদ্ধতি, মি. রানা। নাম্বার দেখে ফোন করুন। ওদের আমরা এরই মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি। এমনকি ওদের ওপর থেকে সমস্ত অভিযোগও তুলে নেয়া হয়েছে।'

নোটবুকে গ্রীনল্যান্ড, আর কলোরাডোর নাম্বার দেখল রানা। প্রথমে কলোরাডোর নাম্বারে ডায়াল করল ও। সাঙ্কেতিক ভাষায় দু'মিনিট কথা হলো সোহানার সাথে। নিয়াজ আর বিনয়ের সাথেও আলোচনা হলো। অবসন মিথ্যে বলেনি।

'এবার আমি আমার বসের সাথে কথা বলতে চাই,' বলল রানা। 'আপনাদের বাইরে যেতে হবে।'

বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টার ঢাকার নাম্বারে ডায়াল করে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের সাথে মিনিট দশেক কথা বলল রানা। বস্ ওকে সবুজ সঙ্কেত দিয়ে জানালেন, সি. আই. এ. যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তার বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা আছে তাঁর হাতে।

কেবিনের দরজা খুলে ওদেরকে ডাকল রানা। 'ব্যাপারটা

এবার শোনা যেতে পারে।'

'মোটামুটি ছবিটা পেলাম,' বলল রানা। 'এবার বলুন, এই রুশ ভদ্রলোক, ইভেনকো রুস্তভ, এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?'

আর্কটিক জোনের অপারেশনাল চীফ জেনারেল ফচের অফিসে বসে কথা বলছে ওরা।

'তিনি গুরুত্বপূর্ণ, এটুকুই শুধু আপনাকে বলা যায়,' বললেন জেনারেল ফচ। 'তাঁর সম্পর্কে বাকি সব তথ্য টপ সিক্রেট।'

ঠাণ্ডা চোখে জেনারেলের দিকে তাকাল রানা, তারপর সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টরের দিকে ফিরল। কর্নেল তাড়াতাড়ি শুরু করল, 'ইভেনকো রুস্তভ সোভিয়েত রাশিয়ার এক নম্বর ওশেনোগ্রাফার। ওদের গোটা জুলিয়েট আর রোমিও সিস্টেম আর্কটিক সী-বেডে বিছানোর কাজটা তিনি নিজে সুপারভাইজ করেছেন। সাথে করে মেরিলিন চার্ট নিয়ে আসছেন তিনি, ওই সিস্টেমের কমপ্লিট ব্লু-প্রিন্ট ওটা। আর্কটিক বরফের তলা দিয়ে আমাদের তীর পর্যন্ত আসতে পারে ওদের সাবমেরিনগুলো, কারণ ওই সিস্টেম গাইড হিসেবে কাজ করে। ব্লু-প্রিন্টের গুরুত্ব কতখানি এবার নিশ্চয়ই বুঝেছেন, মি. রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। মনে মনে ভাবল, আসল জিনিস তোমাদের কপালে নেই, ওই সিস্টেমের নকল ব্লু-প্রিন্ট পাবে তোমরা।

'চার্টগুলো আমাদের হাতে এলে ওদের গোটা অফেনসিভ সিস্টেম ভেঙে চুরমার করে দেব আমরা, পাক্কা দশ বছর পিছিয়ে যাবে ওরা,' বলে চলল কর্নেল অবসন। 'মে মাসে প্রেসিডেন্টের

মস্কোয় যাবার কথা রয়েছে, তখন যদি তাঁর পকেটে মেরিলিন চার্ট থাকে, জোর গলায় কথা বলতে পারবেন তিনি। কাজেই একজন যোগ্য লোককে গ্রীনল্যান্ডে পাঠাতে চাইছি আমরা। আপনি, মি. রানা...'

'তাড়াহুড়ো করে ফেলেছেন,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'কোথাও যাব বলে এখনও আমি রাজি হইনি।' চেয়ার ছেড়ে ম্যাপের সামনে দাঁড়াল ও। ম্যাপের নিচের দিকে একটা তারকা-চিহ্নের ওপর আঙুল রাখল। 'এটা কি কিউট—আইসব্রেকার?'

'হ্যাঁ। আর্কটিকে এক বছর কাটিয়ে মিলওয়াউকিতে ফিরে আসছে।'

'আমি হয়তো চাইতে পারি ঘুরিয়ে নিয়ে আবার ওটাকে আইসফিল্ডে ফিরে যেতে বলা হোক...'

রানাকে বাধা দিল জেনারেল ফচ, 'প্ল্যানটা আমরা করছি, মি. রানা, আপনি নন...'

'তাহলে আপনারাই যান না কেন ওখানে?' জিজ্ঞেস করল রানা। কর্নেলের দিকে ফিরল ও। 'গোটা ব্যাপারটা এমনিতেই জট পাকিয়ে আছে। থিউল-এর সিকিউরিটি লিক সব ভণ্ডুল করে দিতে পারে। ভাল কথা, আমি যদি কাজটা করি, আমার দু'জন সহকারী লাগবে।'

'বেশ তো, লোকের কোন অভাব নেই আমাদের...'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওরা আমার লোক হতে হবে,' বলল ও। 'নিয়াজ আর বিনয়ের কথা ভাবছি আমি।'

'কিন্তু তা কি করে সম্ভব!' ঘোর আপত্তি জানালেন জেনারেল ফচ। 'সি.আই.এ-র অ্যাসাইনমেন্ট অথচ আমাদের কোন লোক

থাকবে না...'

'এখন আর এটা সি.আই.এ-র অ্যাসাইনমেন্ট নয়, জেনারেল,' বলল রানা। 'আমি যদি ভুল বুঝে না থাকি, কেসটা আপনারা রানা এজেন্সিকে দিচ্ছেন, তাই না?'

জেনারেল আমতা আমতা করে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মুখ খুলল কর্নেল অবসন, 'ঠিক তাই, মি. রানা।'

'আমি তাহলে থিউল-এ যাব আগে, নিয়াজ আর বিনয়কে তুলে নেয়ার জন্যে,' বলল রানা। 'ওখান থেকে কার্টিস ফিল্ডে।' আই.আই. ফাইভের সবচেয়ে কাছের এয়ারফিল্ডের ওপর আঙুল রাখল ও।

অসন্তুষ্ট হলেও, নিজেকে দ্রুত সামলে নিলেন জেনারেল ফচ। বললেন, 'এফ.বি.আই. এজেন্ট মরিসন বলছে, কাঁকড়ার আসল পরিচয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বের করে ফেলতে পারবে সে। আমরা যদি আগেভাগে কোন নির্দেশ পাঠাতে চাই, জনসনকে রেডিও মেসেজ পাঠাতে পারব–সে ওখানকার সিকিউরিটি চীফ।'

'আমি যদি ভাল মনে করি, তবেই,' বলল রানা। জেনারেলের কাছ থেকে আবহাওয়ার রিপোর্টটা চেয়ে নিয়ে চোখ বুলাল ও। 'কুয়াশা নেই। কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা। তারমানে, কার্টিস ফিল্ড থেকে আমরা তিনজন কুয়াশার কিনারা পর্যন্ত প্লেনে করে যাব, ওখান থেকে আই.আই. ফাইভে যেতে হবে স্লেজে চড়ে–আদৌ যদি খুঁজে পাই ওটাকে। এরপর ইভেনকো রুস্তভকে সাথে নেব, ধরেই নিচ্ছি ভাঙাচোরা বরফের ওপর দিয়ে পঁচিশ মাইল হেঁটে আই.আই.ফাইভে পৌঁছুতে পারবে সে। এরপর বরফের ওপর দিয়ে একশো বিশ মাইল স্লেজে চড়ে আসতে হবে

আমাদের, ধাওয়া করবে রুশ সিকিউরিটি...'

'কুয়াশার ভেতর থেকে আপনারা বেরিয়ে এলে আর কোন চিন্তা নেই, প্লেনে করে...'

'প্লেন যদি আমাদের খুঁজে পায়,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'কিন্তু পাবে না। চারজন লোক, আর এক জোড়া স্লেজ টীমকে বছরের এ-সময়টায় খুঁজে পাওয়া কি রকম কঠিন, আপনার কোন ধারণা আছে, জেনারেল? আমার তো মনে হয় না আর্কটিকে আপনি কখনও গেছেন।'

মুখ বেজার করে জেনারেল বললেন, 'কেন, প্লেনে করে মানুষকে উদ্ধার করা হয় না?'

'হ্যাঁ, হয়,' ভারী গলায় বলল রানা। 'কিন্তু তা স্রেফ কপালগুণে। একটা প্লেন, নিখোঁজ দলটাকে খুঁজছে না, হঠাৎ তাদের দেখতে পেল—এভাবে।' এক মুহূর্ত থেমে আবার বলল রানা, 'আরেকটা জিনিস আমার ভাল ঠেকছে না। রুস্তভ কখন আসছেন আমরা জানি না।' কর্নেলের দিকে তাকাল ও। 'কিউটকে আর্জেন্ট সিগন্যাল পাঠান, আবার উত্তর দিকে অর্থাৎ আইসফিল্ডের দিকে ফিরে যেতে হবে ওটাকে।' ওয়াল-ম্যাপের এক জায়গায় পেন্সিল দিয়ে একটা তারকা-চিহ্ন আঁকল ও। 'এটা একটা রাঁদিভো পয়েন্ট হতে পারে।'

জেনারেল ফচ চোখ কপালে তুললেন, 'কিন্তু ওটা তো আইসফিল্ডের অনেক গভীরে!'

'তারমানেই বরফ ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হবে কিউটকে,' বলল রানা। 'দু'ঘণ্টার মধ্যে একটা প্লেন চাই, গ্রীনল্যান্ডে নিয়ে যাবে আমাকে। নন-স্টপ ফ্লাইট হতে হবে।'

‘আপনার জন্যে একটা বোয়িং অপেক্ষা করছে।’

‘এবার বলুন, রুস্তভ কখন আসছেন সেটা আপনারা জানছেন কিভাবে,’ নিজের চেয়ারে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল রানা।

নড়েচড়ে বসে শান্তভাবে শুরু করলেন জেনারেল ফচ, ‘লেনিনগ্রাদ থেকে এক লোক হেলসিঙ্কিতে ফিরে আসবে, তার জন্যে অপেক্ষা করছি আমরা। লেনিনগ্রাদে ইভেনকোর এক আত্মীয়ের সাথে দেখা করবে সে, সেই আত্মীয় তাকে জানাবে এন.পি.সেভেনটিন থেকে কোন্ তারিখে রওনা হবেন ইভেনকো। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যে-কোন একটা দিন, এটুকু আমরা জানি। আমাদের লোক লেনিনগ্রাদ থেকে বেরিয়ে এলেই নির্দিষ্ট তারিখটা জানতে পারব।’

‘এমন যদি হয়, লেনিনগ্রাদ থেকে সে বেরুতে পারল না?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘কেন বেরুতে পারবে না!’ রানার কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন জেনারেল। ‘এর আগে কখনও রাশিয়ায় যায়নি সে, সেজন্যেই তাকে পাঠানো হয়েছে। অত্যন্ত অভিজ্ঞ লোক। হেলসিঙ্কিতে পৌঁছে সোজা আমাদের দূতাবাসে রিপোর্ট করবে সে। দূতাবাস থেকে সিগন্যাল পাব আমরা।’

কোন মন্তব্য না করে আপনমনে শুধু কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

তিন

আঠারোই ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার, বিকেল তিনটে পাঁচে লেনিনগ্রাদের

নেভ্স্কি প্রসপেক্টে একজন লোক মারা গেল।

লেনিনগ্রাদে বিকেল তিনটে মানে ওয়াশিংটনে সবেমাত্র সকাল সাতটা। ফ্লোরিডা এক্সপ্রেসে এখনও চড়েনি রানা, এখন থেকে সতেরো ঘণ্টা পর সি.আই.এ-র দলটা ট্রেন থেকে নামতে বাধ্য করবে ওকে।

আমেরিকান ট্যুরিস্ট, আলবার্ট ডকিনস, তুষার ঢাকা তিনটে ধাপ টপকে হোটেল লেনিনগ্রাদ থেকে রাস্তায় নেমে এল। দীর্ঘদেহী, চল্লিশ বছর বয়স; পাসপোর্টে তাকে একজন লেখক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাস্তায় নেমে এসে বাঁ দিকে বাঁক নিল ডকিনস। তুষার মাথায় করে নেভ্স্কি প্রসপেক্টের দিকে হন হন করে এগোল সে।

আরও জোরেশোরে তুষারপাতের হুমকি দিয়ে ফুলে আছে আকাশ। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। আর আধঘণ্টার মধ্যে নেমে আসবে অন্ধকার। এরই মধ্যে স্ট্রীটল্যাম্পগুলো জ্বলতে শুরু করেছে। নেভ্স্কি প্রসপেক্টে পৌঁছে গেল ডকিনস, চওড়া এভিনিউয়ে দাঁড়িয়ে সতর্কতার সাথে দু'দিকে তাকাল সে। ভাব দেখে মনে হবে, সাবধানী লোক, রাস্তা পার হতে ভয় পাচ্ছে। আসলে এভিনিউয়ের একধারে পার্ক করা তিনটে গাড়ি তার মনে খুঁতখুঁতে ভাব এনে দিয়েছে।

কিন্তু না, মাদাম নাতাশা তো দূরের কথা, গাড়িগুলোয় কোন লোকই নেই।

হেলসিঙ্কি থেকে পাঁচ দিন হলো লেনিনগ্রাদে এসেছে ডকিনস, সেই থেকে মাদাম নাতাশা তার গাইড হিসেবে কাজ করছে। হার্মিটেজে যতবার গেছে সে, প্রতিবার সাথে থেকেছে মাদাম

নাতাশা। গাড়িগুলোয়, রাস্তায়, দোকানগুলোর সামনে, কোথাও তাকে দেখতে না পেয়ে ডকিনস ভাবল, তারমানে ওর গল্প বিশ্বাস করেছে মেয়েটা। কাল রাতেই তাকে জানিয়ে দিয়েছে ও, আজ আর হার্মিটেজে যাবে না।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল ডকিনস, তারপর একটা ট্রলি-বাসকে ছুটে আসতে দেখে তাড়াহুড়ো করে রাস্তা পেরোল। তাকে দেখে সহজেই লোকে রাশিয়ান বলে ভুল করতে পারে। ফার কোট, ফার হ্যাট, আর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বুট পরেছে সে।

হাতঘড়ি দেখল ডকিনস, তিনটে বাজতে দু'মিনিট বাকি। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তুমুল ঝগড়ায় মেতে আছে একজোড়া কিশোর-কিশোরী, মেয়েটা ঠাস করে একটা চড় কষাল ছেলেটার গালে। মনে মনে হাসল ডকিনস, টিন-এজারদের নিয়ে কোথায় না সমস্যা নেই।

ওদেরকে পাশ কাটিয়ে এল ডকিনস, দূরে দেখা গেল ওর গন্তব্য, সারি সারি গাছপালায় ঘেরা পার্ক। দস্তানা পরা হাত দুটো ফার কোটের পকেটে ভরে হন হন করে হাঁটছে সে, কালও এই রাস্তা ধরে হার্মিটেজ মিউজিয়ামে গেছে। আর্ট ক্যাটালগটা বগলে করে নিয়ে এসেছে ডকিনস, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কোথায় যাওয়া হয়েছিল, উত্তর দিতে অসুবিধে হবে না।

পার্কের ভেতর, রাস্তার কাছাকাছি লেনিনের স্ট্যাচু দেখা গেল। পার্কে ঢুকে সোজা রাস্তাটা ধরে এগোল ডকিনস, রাস্তার শেষ মাথায় উদয় হলো একজন লোক।

এই কি সেই নাবিক? এর সাথেই তার দেখা হওয়ার কথা?

ইউরি রুস্তভকে আগে কখনও দেখেনি ডকিনস। বিজ্ঞানী, ওশেনোগ্রাফার ইভেনকো রুস্তভের ভাই ইউরি রুস্তভ। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ডকিনস, লোকটা কাছে চলে আসার আগেই তিনটে চিহ্ন দেখতে পেতে হবে তাকে।

একটা এয়ারব্যাগ থাকবে, কিন্তু কাঁধের বদলে বগলে। আছে। গলায় জড়ানো থাকবে লাল একটা স্কার্ফ। আছে। কিন্তু আলো দ্রুত কমে আসছে বলে আরেকটা চিহ্ন চোখে পড়ছে না। কোটের অন্যান্য বোতাম গাঢ় রঙের হবে, কিন্তু ওপরের বোতামটা হবে সাদা।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল ডকিনসের। সর্বনাশ! নাবিক লোকটার পিছনে একজন পুলিস উদয় হয়েছে...নাকি সৈনিক? বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করলেও যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে থাকল সে। এ কি স্রেফ মন্দভাগ্য, এই সময় এই রাস্তায় পুলিস লোকটার উপস্থিতি নেহাতই কাকতালীয় ঘটনা? না ইউরি রুস্তভের পিছু নিয়েছে? মনে হয় না। এমন প্রকাশ্যে কেউ কাউকে অনুসরণ করে না।

তবু ডকিনসের ভয় যায় না। ধরা পড়লে কপালে খারাবি আছে তার, গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে পাঁচ-সাত বছরের জেল হয়ে যাবে। তারচেয়ে বড় কথা, ইভেনকো রুস্তভ কবে রওনা হবে এন.পি. সেভেনটিন থেকে সেই খবরটা জেনারেল ফচের কাছে পৌঁছুবে না।

প্রতি মুহূর্তে দ্রুত কমে আসছে আলো। কাছাকাছি চলে আসছে নাবিক, তার পিছনে পুলিস লোকটার পরনে গাঢ় নীল গ্রেট কোট, দু'জনের মাঝখানে পঞ্চাশ গজের মত ব্যবধান। এ-ও কি

কাকতালীয় ঘটনা যে ইউরি রুস্তভের সাথে একই গতিতে হেঁটে আসছে পুলিস লোকটা? মাঝখানের ব্যবধান কমছেও না, বাড়ছেও না!

ও কি সত্যি ইউরি রুস্তভ?

সাদা বোতামটা এখনও দেখতে পাচ্ছে না ডকিনস। ত্রিশ-বত্রিশ, লোকটার বয়স আন্দাজ করল সে। সোজা তাকিয়ে আছে, তার দিকে নয়, তার পাশ ঘেঁষে সোজা রাস্তা বরাবর। চেহারা লক্ষ করে মনে মনে আঁতকে উঠল ডকিনস। চোয়াল শক্ত হয়ে আছে, মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে হয় হাউমাউ করে কেঁদে ফেলবে, নাহয় জ্ঞান হারাবে। এ থেকে কি প্রমাণ হয় এই লোকই ইউরি...?

এ-ধরনের ঝুঁকি নিয়ে অভ্যস্ত নয় লোকটা।

একেবারে সামনে চলে এল নাবিক, ডকিনস তার সাদা বোতাম দেখতে পেল। তুষারে পা বাধিয়ে নিখুঁত একটা আছাড় খেলো সে, উপস্থিত বুদ্ধিতে এরচেয়ে ভাল কোন উপায় তার মাথায় আসেনি। পুলিস লোকটা এখনও পঞ্চাশ গজ পিছনে। আর্ট ক্যাটালগটা বগল থেকে পড়ে খুলে গেছে, সাদা তুষারে রঙিন ছবিগুলো রক্তের দাগের মত দেখাল। এই ক্যাটালগ দেখেই ডকিনসের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবে ইউরি রুস্তভ। ডকিনস উঠে বসার চেষ্টা করছে, সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল ইউরি।

'বিশ তারিখে রওনা হবেন তিনি,' ডকিনসকে ধরে তুলতে শুরু করল ইউরি। 'বিশ তারিখে, বিশে ফেব্রুয়ারি...এন.পি.সেভেনটিন থেকে রওনা হয়ে আই.আই. ফাইভে পৌঁছুবেন...বিশ, বিশ...'

নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গা থেকে তুষার ঝাড়তে শুরু করল

ডকিনস। ইউরি রুস্তভ তাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের পথে এগোল আবার। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না সে।

ডকিনসের সামনে থামল পুলিস লোকটা। রুশ ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'হাঁটতে পারবেন বলে মনে করেন? অনেক দূর যেতে হবে?'

রুশ ভাষা জানে ডকিনস, কিন্তু ইউরি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। ইংরেজীতে বলল সে, 'কিছু না, গোড়ালিতে একটু মোচড় খেয়েছি, ধন্যবাদ।' কিছুই না বুঝে ওর দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল পুলিস, মুখে সামান্য ব্যথার ভাব নিয়ে একটু হাসল ডকিনস। 'লেনিনগ্রাদ হোটেল থেকে আসছি আমি, মিউজিয়ামে যাচ্ছিলাম...তা বোধহয় আর সম্ভব নয়।'

ক্যাটালগটা তুষার থেকে তুলে ডকিনসের হাতে ধরিয়ে দিল পুলিস। আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরতি পথে হাঁটা ধরল ডকিনস। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে সে। ভান নয়, সত্যিই ব্যথা পেয়েছে।

এ এক দিক দিয়ে ভালই হয়েছে, ভাবল সে। পরশু লেনিনগ্রাদ ছাড়ার কথা তার, রোববার সকালের ফ্লাইটে। কিন্তু এখন জানা গেল ওই একই দিনে এন.পি.সেভেনটিন থেকে আই.আই. ফাইভের উদ্দেশে রওনা হবে ইভেনকো রুস্তভ। তারমানে পরশু নয়, আরও আগে হেলসিঙ্কিতে পৌঁছুতে হবে তাকে। অথচ রুশ কর্তৃপক্ষ জানে, বিশিষ্ট আর্ট ক্রিটিক এবং লেখক আলবার্ট ডকিনস বিশ তারিখের আগে মিউজিয়াম দেখা শেষ করতে পারবেন না। পায়ের ব্যথাটায় কোন ভেজাল নেই, তাড়াহুড়ো করে রাশিয়া ছাড়ার কারণ হিসেবে দেখানো চলবে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে নেভ্স্কি প্রসপেক্টে ফিরে এল ডকিনস, দেখল লাল-চুলো কিশোরীর মান ভাঙাবার জন্যে গলদঘর্ম হচ্ছে জ্যাকেট পরা কিশোর। সারা গালে আলতো চুমোর স্পর্শ নিয়েও কিশোরী ঠোঁট ফুলিয়ে আছে। ইতিমধ্যে তুষারপাত আরও বেড়েছে, সেই সাথে কুয়াশা আর সন্ধ্যা দ্রুত ঢেকে ফেলছে চারদিক। রাস্তা ফাঁকা, কোন গাড়ি আসছে না। পুলিস লোকটা এখনও পিছু পিছু আসছে কিনা দেখার জন্যে একবারও ঘাড় ফেরায়নি ডকিনস। ফুটপাথ থেকে নেমে পড়ল সে।

জ্যাকেট পরা কিশোর শেষ পর্যন্ত জিতল। কিশোরীর হাতে আরও একটা কিল খেলো সে, কিন্তু মিষ্টি আদরের কিল। মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে গাড়িতে উঠল সে। ইগনিশন কী ঘুরিয়ে স্টার্ট দিল। বোমার মত বিস্ফোরিত হলো এগজস্ট। ঝাঁকি খেয়ে লাফ দিয়ে সামনে ছুটল গাড়ি। এতক্ষণে মনে পড়ায় হেডলাইটের সুইচ অন করল সে।

খুঁড়িয়ে হাঁটাটা ডকিনসের যদি ভান হত, লাফ দিয়ে অনায়াসে সরে আসতে পারত সে। গাড়িটা তার গায়ের ওপর এসে পড়ছে, এই সময় চোখ ধাঁধানো আলো জ্বলে উঠল। একেবারে অন্ধ হয়ে গেল ডকিনস। কিশোর দেখল, গোটা উইন্ডস্ক্রীন জুড়ে রয়েছে ফার কোট পরা লোকটা। দ্রুত হুইল ঘোরাল সে, গাড়ির নাকে লোকটাকে আটকে নিয়ে ফুটপাথের সাথে ধাক্কা খেলো। রাস্তা থেকে ফুটপাথ আড়াই ফিট উঁচু, ডকিনসের মাথা আর বুক পড়ল ফুটপাথের ওপর, শরীরের বাকি অংশ থাকল রাস্তায়। মট মট করে পাঁজর ভাঙার আওয়াজ হলো। গাড়ির সামনের দুটো চাকা ডকিনসকে চাপা দিয়ে উঠে পড়ল ফুটপাথের ওপর। বুক থেকে

চাকা নামার আগেই মারা গেছে ডকিনস।

রাস্তার ওপর থেকে চিৎকার করে উঠল এক মহিলা। একশো গজ দূরে রাস্তা পার হবার জন্যে থেমেছে ইউরি রুস্তভ, দৃশ্যটা দেখে মাথা ঘুরে গেল তার।

বন্দরে অপেক্ষা করছে ট্রলার বার্জেন, তিন ঘণ্টা পর নোঙর তুলবে। টলতে টলতে রাস্তা পেরোল ইউরি, চোখে অন্ধকার দেখছে। গোটা ব্যাপারটাই ভণ্ডুল হয়ে গেছে, আমেরিকান লোকটা মারা যাওয়ায় ওয়াশিংটনে মেসেজটা পৌঁছুবার আর কোন উপায় থাকল না। তার ভাইকে সাবধান করে দেয়াও এখন আর সম্ভব নয়।

ইভেনকো রুস্তভ রোববারে এন.পি. সেভেনটিন থেকে রওনা হয়ে যাবে, অথচ আমেরিকানরা সে-ব্যাপারে জানবে না কিছুই।

নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে বন্দরের দিকে হাঁটছে ইউরি। মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া কিছুই করার নেই তার।

শনিবার সকাল আটটা, এস.এস.এস. হেডকোয়ার্টার।

'আমেরিকান লোকটা, কি যেন নাম...ডকিনস, নেভ্স্কি প্রসপেক্টে মারা গেছে কাল,' বলল আর্কটিক মিলিটারি জোনের স্পেশাল সিকিউরিটি সার্ভিস চীফ কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ। 'কি যেন ঠিক মিলছে না। উদ্ভট কিছু একটা আছে, অথচ আঙুল তুলে দেখাতে পারছি না।'

গৌরবর্ণ বিশাল দৈত্য সে। চকচকে কামানো মাথাটা সব সময় গরম হয়ে থাকে। গোটা রাশিয়ায় তার মত কাজপাগল লোক দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। যখন সে শান্তভাবে কথা বলে মনে

হয় সিংহ গজরাচ্ছে। কংক্রিটের মেঝেতে পা ঠুকলে বুঝতে হবে মাত্র রেগে উঠতে শুরু করেছে সে, তখন চেয়ার-টেবিল কেঁপে উঠলেও ঘরে যারা উপস্থিত থাকে তাদের এক চুল নড়ার শক্তি থাকে না। নিজের যেমন প্রাণশক্তির সীমা-পরিসীমা নেই, তেমনি অধীনস্থ লোকদের চরকির মত ব্যস্ত রাখতেও তার জুড়ি মেলা ভার।

'কমপ্লিট একটা রিপোর্ট চাই আমি, জুনায়েভ,' আবার বলল কর্নেল। 'গাইড নাতাশাকে আনো। পুলিস লোকটা দেখেছে, তাকেও। প্রত্যক্ষদর্শী আর যারা আছে তাদের সবাইকে বিকেল তিনটের মধ্যে এই অফিসে এক লাইনে দাঁড় করাও। আমি নিজে ওদের জেরা করব।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে নিকিতা জুনায়েভ বলল, 'কর্নেল কমরেড।'

'এয়ারপোর্টে খোঁজ নাও। একে-তাকে জিজ্ঞেস করলে অনেক তথ্য পেয়ে যাবে। একা এসেছিল কিনা জানতে চাই আমি। বিকেলের আগে।'

'কর্নেল কমরেড।'

'পুলিস হেডকোয়ার্টারে যাও, জুনায়েভ। ডকিনসের ব্যক্তিগত সমস্ত জিনিস-পত্র সাথে করে নিয়ে এসো। ফেব্রুয়ারি মাসে লেনিনগ্রাদে আমেরিকান ট্যুরিস্ট! অসম্ভব! এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ঘাপলা আছে।'

এতক্ষণ কর্নেল একবারও মুখ তুলে তাকায়নি। সহকারী জুনায়েভকে নির্দেশ দিচ্ছে মুখে, মনে মনে ভাবছে মেয়েটার এবার বিয়ে না দিলেই নয়, আর চোখ বুলাচ্ছে খোলা একটা ফাইলে।

নিকিতা জুনায়েভের বয়স পঁয়ত্রিশ, কর্নেলের চেয়ে পনেরো বছরের ছোট। এস.এস.এস. চীফের সহকারী হবার সমস্ত যোগ্যতা তার আছে, আর আছে কর্তার অহেতুক আস্ফালন এবং ঝম ঝম বৃষ্টির মত নির্দেশগুলোকে শান্তভাবে গ্রহণ করার দুর্লভ গুণ। এই গুণটার জন্যেই আজও কর্নেলের সহকারী হিসেবে টিকে আছে সে। এর আগের লোকটা আত্মহত্যা করেছিল।

'কর্নেল কমরেড,' শান্ত গলায় বলল জুনায়েভ, 'লোকটার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই যে...'

'কি! এখনও তুমি যাওনি!'

জুনায়েভ কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। ফাইল বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল কর্নেল বলটুয়েভ, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল চেয়ারটা। জানালার সামনে এসে বাইরে তাকাল সে। সকাল আটটায়ও বাইরে অন্ধকার। ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল, তুষার মাথায় করে কাজে যাচ্ছে লোকজন।

পকেট থেকে খুদে একটা দাবার ছক বের করে আবার ডেস্কে বসল কর্নেল। ঘরের ভেতর হিসহিস শব্দে একটা স্টোভ জ্বলছে। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে টেলিপ্রিন্টারের আওয়াজ। গভীর মনোযোগের সাথে দাবার একটা জটিল সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল সে। সাদা আর কালো ঘুঁটির অবস্থান দেখে যে-কারও মনে হবে, পরিণতি ড্র হতে বাধ্য। অথচ কাসপারভ এই খেলায় জিতেছে।

সমস্যাটা নিয়ে তিন দিন ধরে মাথা ঘামাচ্ছে কর্নেল। আজ মাত্র আধ ঘণ্টার চেষ্টায় সমাধান বেরিয়ে এল। আত্মবিশ্বাসের মাত্রা বেড়ে গেল তার, বারবার মনে হতে লাগল ডকিনসকে সন্দেহ

করে ভুল করছে না সে।

লেনিনগ্রাদে ইহুদিদের নিয়ে বিরাট সমস্যা রয়েছে। প্রতি বছর বেশ কিছু ইহুদি পালিয়ে চলে যাচ্ছে ইসরায়েলে। কোন সন্দেহ নেই ইহুদিদের আন্ডারগ্রাউন্ড একটা সেল অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে। কর্নেল বলটুয়েভের বিশ্বাস, এই আন্ডারগ্রাউন্ড সেল টাকা পাচ্ছে বিদেশ থেকে। ডকিনসের ব্যাপারটা জানার সাথে সাথে তার মনে হয়, ইহুদিদের জন্যে লোকটা টাকা নিয়ে আসেনি তো? সে জন্যেই, লোকটা মারা গেলেও, তার লাশ পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে সে।

শনিবার সকাল আটটায়ও কর্নেল বলটুয়েভ জানে না যে সময়ের সাথে ভয়ানক এক দৌড়-প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছে তাকে—রোববারে এন.পি.সেভেনটিন থেকে ইভেনকো রুস্তভ যাত্রা শুরু করার আগে ডকিনস রহস্য ভেদ করতে হবে তার।

ওয়াশিংটনে এখনও মাঝরাত, শুক্রবার। রানা এখনও ফ্লোরিডা এক্সপ্রেসের স্লিপিং কারে ঘুমাচ্ছে। সোভিয়েত ঘাঁটি এন.পি.সেভেনটিনে এখন ভোর চারটে, কিয়েভ থেকে সবেমাত্র এখানে পৌঁচেছে ইভেনকো রুস্তভ।

প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো গুনতে গুনতে প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে ইভেনকো রুস্তভ।

বরফ-দ্বীপ এন.পি.সেভেনটিনের মাঝখানে সরু একটা এয়ারস্ট্রিপ, আরেকবার পরিষ্কার করে প্লেন নামার উপযোগী রাখা হয়েছে। ভোর চারটে, চাঁদের আলো গায়ে মেখে এয়ারস্ট্রিপের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। পশ্চিমে আমেরিকানদের রিসার্চ বেস

আই.আই.ফাইভ, মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে। কিন্তু ইভেনকো তাকিয়ে আছে পুবে। বরফ-দ্বীপের বাইরে জ্যান্ত পোলার প্যাক আড়মোড়া ভাঙছে, চাঁদের আলোয় ভাঙা কাঁচের সীমাহীন স্তূপের মত দেখতে লাগল। ঘরগুলো তার পিছনে, সমতল ছাদ তুষারে ঢাকা পড়ে আছে। পায়ের আওয়াজ ওদিক থেকেই এল। শক্ত কাঠ হয়ে গেল ইভেনকো।

এই আওয়াজ তার চেনা। সিকিউরিটি এজেন্ট পিটার আন্তভ তার ওপর কড়া নজর রাখছে। পায়ের আওয়াজ ঠিক পিছনে এসে থামল। 'আপনার শরীর খারাপ, কমরেড অ্যাকাডেমিশিয়ান?'

'এরচেয়ে ভাল কখনও ছিলাম না!'

'না, রাত শেষ হয়নি বাইরে চলে এসেছেন, তাই জিজ্ঞেস করছি।' সুর শুনে মনে হবে না যে জেরা করছে, তবে উত্তরের জন্যে অপেক্ষায় থাকে।

'রোজই এ-সময় ঘুম ভাঙে আমার, এতদিনে কথাটা তোমার জানা উচিত ছিল।' সে যে রেগে গেছে তা গোপন করার চেষ্টা করল না ইভেনকো। কাজ হলো, গজগজ করতে করতে ঘরগুলোর দিকে ফিরে গেল আন্তভ।

কোটের পকেটে ইভেনকোর দস্তানা পরা হাত দুটো কঠিন মুঠো হয়ে উঠল। আন্তভ একটা সমস্যা হতে যাচ্ছে। ঘর থেকে সে বেরুলেই তার পিছু নিচ্ছে লোকটা। রেগে ওঠার আরেকটা কারণ, পরিকল্পনার এমন একটা পর্যায়ে পৌঁচেছে সে যখন সিকিউরিটির কাউকে দেখলেই তার সারা শরীরে যেন আগুন ধরে যায়। পিটার আন্তভ কর্নেল বলটুয়েভের বিশ্বস্ত এজেন্ট, আর কর্নেল বলটুয়েভের স্পেশাল সিকিউরিটি সার্ভিসই ছয় মাস আগে তার

প্রাণপ্রিয় সুমাইয়া নাজিনকে খুন করেছে।

সুমাইয়ার কথা মনে পড়তেই চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল ইভেনকোর। তারই মত ইহুদি ছিল সুমাইয়া। দু'জনের বয়সের ব্যবধান খুব বেশি হলেও, পরস্পরকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। বিয়ে হয়নি বটে, কিন্তু লেনিনগ্রাদে যখনই গেছে সে, দু'জন স্বামী-স্ত্রীর মত একসাথে থেকেছে। হঠাৎ একদিন এন.পি.সেভেনটিনে খবর এল, সুমাইয়া সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গেছে।

কিছুদিন পর লেনিনগ্রাদে ছুটিতে এসে পুরো ব্যাপারটা জানতে পারল ইভেনকো। সুমাইয়া আন্ডারগ্রাউন্ড সেলের সাথে জড়িত, জানত সে। গোপনে চাঁদা তুলত সুমাইয়া, প্রতিভাবান ইহুদিদের ইসরায়েলে পালাবার ব্যবস্থা করে দিত। আন্ডারগ্রাউন্ড সেলের আরেকটা কাজ ছিল গোপন সামরিক তথ্য সংগ্রহ করা, সময় মত সে-সব ইসরায়েলে পাচার করা হত। যেভাবেই হোক, কর্নেল বলটুয়েভ সন্দেহ করতে শুরু করে সুমাইয়াকে। এক গভীর রাতে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্পেশাল সিকিউরিটির হেডকোয়ার্টারে। সেখানে সুমাইয়ার ওপর কি ধরনের নির্যাতন চালানো হয় তা জানা যায়নি। কর্তৃপক্ষ শুধু তার আত্মীয়দের জানায়, সিঁড়ি থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে গিয়েছিল সুমাইয়ার, তাতেই মারা যায় সে।

হাতঘড়ি দেখল ইভেনকো। চারটে দশ, স্থানীয় সময়। আরও বিশ ঘণ্টা পর রওনা হবে সে।

সময়ের হিসেবটা ভারি গুরুত্বপূর্ণ, একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে স্রেফ মারা পড়বে সে। আমেরিকানরা তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে, সে তার রওনা হবার দিন-তারিখ নিজেই নির্ধারণ

করবে, এবং সেই নির্দিষ্ট তারিখ আর বদল করা চলবে না।

ছোট ভাই ইউরির সাথে কিয়েভে দেখা করেছে সে। ইউরির সাথে নিশ্চয়ই দেখা হয়েছে আমেরিকান ট্যুরিস্ট ডকিনসের। ডকিনসের মাধ্যমে আমেরিকানরা তার রওনা হবার নির্দিষ্ট তারিখ জেনে গেছে। এখন শুধু অপেক্ষা, আর বিশ ঘণ্টা পর সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়া। তারপর যা থাকে কপালে।

কর্নেল বলটুয়েভ হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে। শনিবার সকাল এগারোটার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জড়ো করা হলো হেডকোয়ার্টারে, কর্নেল নিজে তাদেরকে জেরা করল। জেরা করার পর প্রত্যেকের সম্পর্কে একটা করে মন্তব্য করল সে। মাদাম নাতাশা সম্পর্কে বলল, 'একটা দুগ্ধবতী গাভী, জুনায়েভ। এ-ধরনের মেয়েদেরই যমজ বাচ্চা হওয়া উচিত, দিন-রাত দুধ খেয়েও শেষ করতে পারবে না। ওকে দেখে আমারই ইচ্ছে হচ্ছিল সদ্যজাত খোকা হয়ে যাই। নিশ্চয়ই ডকিনসেরও তাই হয়েছিল।'

পুলিস লোকটার সাথেই সবচেয়ে বেশি সময় কাটাল কর্নেল। কর্নেলের ঘর থেকে এক ঘণ্টা পর যখন বেরুল সে, মনে হলো তার ওপর স্টীম রোলার চালানো হয়েছে। হোটেল লেনিনগ্রাদের বয়-বেয়ারা থেকে শুরু করে ম্যানেজার পর্যন্ত সবাইকে জেরা করা হলো। তলব পেয়ে আসতে হলো এয়ারপোর্ট অফিশিয়ালদের।

কিন্তু কারও কাছ থেকেই সন্দেহ করার মত কোন তথ্য পাওয়া গেল না।

সবশেষে জুনায়েভ বলল, 'কর্নেল কমরেড, আমার মনে হয়, ইহুদিদের সাথে ডকিনসের কোন সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়া বৃথা।'

চেয়ার-টেবিল, দেয়াল, আলমারি, সব কাঁপতে লাগল, কারণ কর্নেল বলটুয়েভ থপ থপ পা ফেলে পায়চারি করছে। 'ওদেরকে যে কেউ টাকা এনে দিচ্ছে, এ আমরা জানি,' বলল সে। 'একে একে পাঁচদিন মিউজিয়ামে গেল ডকিনস, প্রতিবার সাথে ছিল গাভীটা। তারপর, কাল কি ঘটল?'

'রোড-অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল সে,' নিরীহ ভঙ্গিতে বলল জুনায়েভ।

'তার আগে!' চোখ পাকাল কর্নেল। 'রুটিন ব্রেক করেছে সে, জুনায়েভ! গাইডকে রাতেই বলে রাখল শরীর খারাপ, কাল সে বাইরে বেরুবে না, অথচ চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল–একা। কেন, জুনায়েভ, কেন?' মেঝেতে সবুট পা ঠুকল সে।

'শরীর ভাল ছিল তাই মিউজিয়ামে যাচ্ছিল...'

'চারটেয়, যখন মিউজিয়াম বন্ধ হবার সময় হয়ে এসেছে?'

'হয়তো কারও সাথে দেখা করতে যাচ্ছিল...'

কর্নেলের চেহারায় বিজয়ের উল্লাস ফুটে উঠল। 'ঠিক তাই। কিন্তু কার সাথে? দেখা যে হয়নি, এটা পরিষ্কার, কারণ তার আগেই সে মারা যায়। এসো, গোটা ব্যাপারটা আবার স্মরণ করি। ডকিনস হোটেল থেকে বেরুল, পার্কে ঢুকল...'

'আছাড় খেয়ে পা মচকাল...'

'মনে হলো আছাড় খেয়ে পা মচকেছে, জুনায়েভ,' বাধা দিয়ে বলল কর্নেল। 'দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আছাড় খেলো সে একজন নাবিকের সামনে। কেন? কে এই নাবিক?'

'যে-কেউ হতে পারে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল জুনায়েভ।

'উঁহুঁ, তার পরিচয় জানতে হবে আমাদের। লোকটার বগলে

একটা এয়ারব্যাগ ছিল, যাচ্ছিল বন্দরের দিকে।' টেবিলের সামনে পায়চারি থামাল সে, দেরাজ থেকে একটা ফাইল বের করল। ডকে কি ঘটছে না ঘটছে তার দৈনন্দিন রিপোর্ট লেখা হয় এই ফাইলে। 'কাল একটাই মাত্র জাহাজ নোঙর তুলেছে, বার্জেন, একটা ট্রলার। তারমানেই দাঁড়াল, নাবিক লোকটা বার্জেনে ওঠার জন্যে বন্দরে যাচ্ছিল।'

'ফাইলটা আমি দেখেছি, কর্নেল কমরেড,' বলল জুনায়েভ। 'বার্জেনের ক্রুর সংখ্যা তিরিশ...'

'কিন্তু তালিকাটা এখানে নেই–যোগাড় করো! বিকেলের মধ্যে চাই আমি।'

'কিন্তু এত অল্প সময়ের ভেতর...'

'সেটা তোমার সমস্যা!' নিজের চেয়ারে বসল কর্নেল। দাবার পকেট সংস্করণ ছকটার ভাঁজ খুলে খেলায় মন দিল সে। জুনায়েভ দরজার কাছে পৌঁছুল। 'ভাল কথা, এ হপ্তায় আমি মস্কোয় থাকার সময়, ফিরে এসে দেখলাম, আবার তুমি ইভেনকো রুস্তভের এন.পি. সেভেনটিনে যাবার আবেদনে সই করেছ। আমার ধারণা ছিল, রুস্তভ তার কাজ শেষ করেছে ওখানে।'

'প্রায় শেষ করেছে, হ্যাঁ,' দরজার কাছ থেকে বলল জুনায়েভ। কর্নেল হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করায় সামান্য অস্বস্তি বোধ করল সে। 'শেষ-বারের মত কয়েকটা ডেপথ-সাউন্ডিং এক্সপেরিমেন্ট বাকি ছিল, তাই...তাছাড়া, তার হাবভাবে মনে হলো ব্যাপারটা আপনিও জানেন...'

'ঠিক আছে, জুনায়েভ,' মুখ না তুলেই বলল কর্নেল। 'ঠিক আছে। ওখানে তার আর কোন কাজ নেই মনে করেছিলাম, তাই

অবাক লাগল।'

চল্লিশ হাজার ফিট উঁচু আকাশ-পথে ওয়াশিংটন থেকে থিউলে পৌঁছুতে ছয় ঘণ্টা লাগল। শনিবার সকাল এগারোটায় ঘুম ভাঙার পর রানা দেখল ওদের বোয়িং গ্রীনল্যান্ডে নামার জন্যে এয়ারপোর্টকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করেছে। সকাল, কিন্তু ধবধবে চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল রানা, এফ.বি.আই. এজেন্ট মরিসনকে বলল, 'মনে হচ্ছে যেন এই তো পাঁচ মিনিট আগে ওয়াশিংটন থেকে রওনা হয়েছি।'

সদ্য ভাঁজ ভাঙা নীল সুট পরে আছে মরিসন, নিখুঁত দাড়ি কামানো মুখে একটা সিগারেট গুঁজে নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল। 'তুমি তো দিব্যি ঘুমালে। আমার মনে হচ্ছে পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে।'

ক্ষীণ একটু হাসল রানা। ভোর পাঁচটায় বোয়িং টেক অফ করার পাঁচ মিনিট আগে এয়ারপোর্টে পৌঁছায় মরিসন। শেষ মুহূর্তের নির্দেশে প্লেনে চড়তে হয়েছে তাকে, কাঁধে গুরুদায়িত্ব—থিউল-এ একজন রুশ গুপ্তচর আছে, খুঁজে বের করতে হবে তাকে। বেচারার নার্ভাস না হয়ে উপায় কি!

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। যতদূর দৃষ্টি যায় গ্রীনল্যান্ড আইসক্যাপের সমতল ধু-ধু প্রান্তর। খানিক দূরে আকাশের দিকে উঁচু হয়ে রয়েছে হাজার ফিট লম্বা রাডার মাস্ট, মাথায় লাল সতর্ক-সংকেত জ্বলছে আর নিভছে। চারদিকে তিন হাজার মাইল রেঞ্জ ওটার, ডিসট্যান্ট আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেমের প্রধান স্টেশন।

'টেনিসনের অফিসে দেখা করব তোমার সাথে,' হঠাৎ বলল

মরিসন। 'হয়তো সন্ধের দিকে কোন এক সময়।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। কথাটার একটা তাৎপর্য আছে। মরিসন বলতে চাইছে সন্ধের মধ্যে কাঁকড়ার পরিচয় বের করে ফেলবে সে। নাকি এরই মধ্যে পরিচয়টা জেনে ফেলেছে? বেসে পৌঁছেই গ্রেফতার করবে তাকে?

বোয়িং ল্যান্ড করল। রানার জন্যে অপেক্ষা করছে মাইকেল জনসন। রানার পরনে ফার পারকা থাকলেও, স্থির বাতাস প্রচণ্ড ঘুসির মত আঘাত করল চোখে মুখে। জিরো থেকে চল্লিশ ডিগ্রী নিচে রয়েছে টেমপারেচার। সিঁড়ি বেয়ে নেমে মাইকেল জনসনের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরল রানা, দু'জনেই দস্তানা পরে রয়েছে।

জনসন একটু খাটো, পাঁচ ফিট চার। লম্বাটে মুখে বেমানান গাম্ভীর্য, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, তবে চারপাশ কুঁচকে সরু হয়ে নেই চোখ। করমর্দন করার সময় রানাকে সে বলল, 'আপনার অভিযানের জন্যে সব রেডি করে রেখেছি, মি. রানা...।' সিঁড়ির মাথায় মরিসনকে দেখে থেমে গেল সে। তরতর করে নেমে এল মরিসন, ওদেরকে পাশ কাটিয়ে কর্নেল টেনিসনের দিকে এগোল। কর্নেল টেনিসনই ক্যাম্প কমান্ডার। 'কে ও?'

একটা কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কি জানি,' খানিকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ও। 'বোবা তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্লেনে কোন কথাই বলেনি। আমি অবশ্য ঘুমিয়েই...'

মুখ তুলে আবার সিঁড়ির মাথার দিকে তাকাল সিকিউরিটি চীফ, চীফ পাইলট ধাপ বেয়ে নেমে আসছে। 'এক্সকিউজ মি,' পাইলটের পথরোধ করে দাঁড়াল সে। 'দ্বিতীয় লোকটা–কে ও? কথা ছিল এই ফ্লাইটে শুধু মি. মাসুদ রানা আসবেন।'

পাইলটের এক হাতে ফ্লাইট হেলমেট দেখা গেল, অপর হাত দিয়ে পারকার হুডটা মাথায় পরল সে। 'যখনই আসি এখানে, আগের বারের চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা লাগে। চিনি না, একেবারে শেষ মুহূর্তে প্লেনে চড়ল লোকটা। সরকারি গাড়ি করে এল...'

'আমি এখানকার সিকিউরিটি চীফ, অথচ...,' রানাকে ইশারা করে রাগের সাথে ঘুরে দাঁড়াল জনসন, একটা জীপের দিকে নিয়ে চলল রানাকে। 'ঠিক আছে, ওর ব্যাপারটা পরে চেক করব আমি।' রানাকে পাশে নিয়ে জীপে বসল, চাবি ঘোরাল ইগনিশনে। 'যা বলছিলাম, আপনার অভিযানের জন্যে সব রেডি করা আছে, মি. রানা। ইস্ট গ্রীনল্যান্ড কোস্টে অর্থাৎ কার্টিস ফিল্ডে একজোড়া সিকোরস্কি হেলিকপ্টার পাঠানো হয়েছে। আপনার জন্যে মি. নিয়াজ আর মি. বিনয় অপেক্ষা করছে হেডকোয়ার্টারে।' চওড়া রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে জীপ চালাচ্ছে সে। ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছে ওরা। সামনের জীপে, বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে ক্যাম্প কমান্ডার কর্নেল টেনিসন আর এফ.বি.আই. এজেন্ট মরিসন। 'একজোড়া নরওয়েজিয়ান-টাইপ স্লেজ-ও পাঠানো হয়েছে কার্টিস ফিল্ডে...'

'ওগুলো কোন কাজেরই নয়,' বাধা দিল রানা। 'আমি এস্কিমো স্লেজের কথা বলেছিলাম—ওগুলো অনেক বেশি ভারী, বরফ যতই এবড়োখেবড়ো হোক ভেঙে পড়ে না।'

জনসনকে বিস্মিত দেখাল। 'আমরা নিজেরাও তো নরওয়েজিয়ান-টাইপ স্লেজ ব্যবহার করি। এস্কিমো স্লেজ নেইও আমাদের...'

'আছে। শেষবার যখন এসেছিলাম, বড় হেলিকপ্টার হ্যাঙ্গারের পিছনে একজোড়া দেখেছিলাম বলে মনে পড়ছে।'

‘লজ্জা দিলেন, মি. রানা!’ হাসতে লাগল সিকিউরিটি চীফ। ‘একবার উঁকি দেবেন নাকি? সামনের বাঁকে পৌঁছে সোজা না গিয়ে ডান দিকে গেলেই...’

‘এখনই?’

‘নয় কেন!’ বলল জনসন। ‘যতদূর বুঝেছি, আপনার খুব তাড়া আছে।’

রোলার দিয়ে চ্যাপ্টা করা তুষার-পথ ধরে ছুটল জীপ, তেমাথায় পৌঁছে ডান দিকে ঘুরে গেল। বাঁ দিকে, বেশ খানিকটা দূরে দেখা গেল ক্যাম্প—গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে ঢালু ছাদ লাগানো অনেকগুলো ঘর। ওদের সামনে, সে-ও অনেকটা দূরে, বিরাট একটা হ্যাঙ্গার। সিকি মাইল সামনে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা সামরিক বিমানঘাঁটি চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে—গোটা রানওয়ে নিরেট বরফে ঢাকা। বেড়ার সামনে, হ্যাঙ্গারের কাছাকাছি, কমলা রঙের নিশ্চল একটা স্নো-প্লাউ দেখা গেল। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল জনসন। ‘গোটা এলাকার রিপোর্ট। ঠিক কোন্ এলাকার ওপর আপনি ইন্টারেস্টেড আমি জানি না। এবড়োখেবড়ো বরফ...না কি যেন বললেন?’

‘রাফ আইস।’

হুল ফোটানো আর্কটিক বাতাস সহ্য হচ্ছে না রানার। এরইমধ্যে অসাড় হয়ে গেছে মুখ, শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। প্রধান রাস্তা ধরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কমান্ডার টেনিসনের জীপ, পিছনের লাল আলো জোড়া দ্রুত অস্পষ্ট হয়ে এল। হঠাৎ আরেকটা জীপ দেখতে পেল রানা। প্রধান রাস্তা ধরে ক্যাম্পের দিক থেকে

আসছে। না, ওদের দিকে নয়, বোয়িং-এর দিকে ছুটে গেল সেটা।

‘কুয়াশার খবর কি?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ভাঁজ খুলে চোখ রাখল ওয়েদার রিপোর্টে।

‘থ্যাঙ্ক গড, কোথাও কোন ছিটেফোঁটা কুয়াশাও নেই। এখান থেকে নরওয়ে পর্যন্ত আবহাওয়া একেবারে পরিষ্কার।’

‘কিন্তু এই অবস্থা কতক্ষণ থাকে সেটাই হলো কথা।’

কাঁধ ঝাঁকাল জনসন। ‘আর্কটিক ওয়েদার মেয়েদের মনের মত, দেবতারাও হদিস পান না।’

জীপের গতি কমিয়ে দিল জনসন, তাকাল রানার দিকে। রানা রিপোর্ট পড়ছে। জীপ থামল। দস্তানা পরা ডান হাতটা মুখের সামনে তুলে আঙুলগুলো বার কয়েক ভাঁজ করল জনসন। ‘পোকা ঢুকল না মাছি!’ আপনমনে বিড়বিড় করল সে। ইঞ্জিন সচল, বন্ধ করা হয়নি। দস্তানা খুলে ডান হাতটা পকেটে ভরল সে। বেরিয়ে এল পয়েন্ট থ্রী-এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন নিয়ে। বিদ্যুৎগতিতে রানার কপালের পাশে ব্যারেল দিয়ে আঘাত করল সে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে মাথাটা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা। কপালের পাশটা ভেতর দিকে দেবে না গিয়ে, চুল সহ খুলির খানিকটা চামড়া হারাল। ছোঁ দিয়ে ইগনিশন থেকে চাবিটা বের করেই তুষারের দিকে ছুঁড়ে দিল ও। এবার রানার মাথার মাঝখানটা লক্ষ্য করে রিভলভারের ব্যারেল নামাল জনসন। চোখ-ধাঁধানো আলোর বিস্ফোরণ ঘটল মাথার ভেতর, পরমুহূর্তে ঘন কালো অন্ধকারে নিজেকে হারিয়ে ফেলল রানা।

চার

কুণ্ডলী পাকিয়ে তুষারের ওপর পড়ে আছে রানা। জ্ঞান ফিরে এলেও প্রচণ্ড ব্যথায় মাথা তুলতে পারছে না। ফর্সা, ভরাট একটা হাসিখুশি মুখ ঝুঁকে আছে ওর ওপর। হাতের ফ্লাস্কটা রানার ঠোঁটের কাছে ধরল সে। 'এক ঢোক খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, রানা।'

ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা, কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু করল মাথা। সব ঝাপসা, কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেও লোকটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল না। মুখ খুলল, খানিকটা ব্র্যান্ডি চালান করে দিল পেটে। প্রায় সাথে সাথে কেটে গেল ঝাপসা ভাব। লম্বা করে হিম বাতাস টানল কয়েকবার। ব্র্যান্ডির চেয়ে বেশি কাজ হলো তাতে। 'সরো, বিনয়...' নিজেই উঠে বসল রানা, তারপর দাঁড়াতে চেষ্টা করল।

'আরেকটু বিশ্রাম নিয়ে...'

তবু দাঁড়াল রানা, দাঁড়িয়ে টলতে লাগল। পড়ে যাচ্ছে, হাত বাড়িয়ে ধরে সিধে হতে সাহায্য করল বিনয়। জনসনের জীপ কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে রানার মনে পড়ল চাবিটা তুষারে ফেলে দিয়েছিল সে। আরও খানিক দূরে আরেকটা জীপ দেখা গেল—উইন্ডস্ক্রীনের কাঁচ ফেটে গেছে, সামনের ডান দিকের টায়ার বসে পড়েছে। 'কোন্ দিকে গেল জনসন?'

'এয়ারফিল্ডের দিকে...ব্যাপারটা কি, রানা? জনসন আমাকে গুলি করছে দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম...'

'সে-ই কাঁকড়া—সিকিউরিটি লিক।' এয়ারফিল্ডের দিকে

তাকিয়ে কিছুই দেখল না রানা। কাঁটাতারের বেড়ার মাঝখানে গেট, গেটের পাশে গার্ড-পোস্ট, খানিক দূরে কমলা রঙের স্নো-প্লাউ, আরও সামনে হ্যাঙ্গার। জনসনের ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও।

বিনয় প্রথমে ভেবেছিল রানা মারা গেছে। কিন্তু ওকে নড়তে দেখে নিজের অজান্তেই হাসতে শুরু করে সে। 'সিকিউরিটি লিক সম্পর্কে একটা গুজব অবশ্য আমরাও শুনেছি। তোমাকে নিতে আসতে দেরি করে ফেলি আমি, পাইলট বলল জনসন তোমাকে জীপে করে নিয়ে গেছে...' হঠাৎ বোকা লাগল নিজেকে, এত কথা কাকে বলছে সে?

বাতাসের গতিতে এয়ারফিল্ডের দিকে ছুটছে রানা। পিছু নিল বিনয়। বলল, 'তার পালাবার কোন উপায় নেই। তোমার প্লেন ল্যান্ড করার ঠিক আগে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে টেনিসন। বেস সীল করে দেয়া হয়েছে...'

'তুমি জানো জনসন কপ্টার চালাতে জানে না?' পাল্টা চিৎকার করল রানা। বিনয় ভাবল, মাথায় দগদগে ঘা নিয়ে, সদ্য জ্ঞান ফেরা একজন লোক এত জোরে কিভাবে দৌড়ায়?

মাথার ক্ষতটা দপ দপ করছে, বসে পড়তে ইচ্ছে করছে রানার। প্রচণ্ড রাগ আর জেদের বসে ছুটে চলেছে ও। হতে পারে জনসন রাশিয়ান স্পাই, কিন্তু ওর সাথে তার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই—তবু ওকে মারল কেন সে? ও যদি মারা যেত?

না, এই লোককে ছাড়া যায় না।

নির্জন গার্ড-পোস্ট। খানিকটা দূরে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। হাঁপাতে হাঁপাতে পাশে চলে এল বিনয়।

'রিভলভার আছে তোমার কাছে? গুড।' রিভলভারটা বিনয়ের

হাত থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রানা। 'পিছনে থাকো!'

হাতে উদ্যত কোল্ট পয়েন্ট ফরটিফাইভ নিয়ে সাবধানে গার্ড পোস্টের দিকে এগোল রানা। ঘরটা কংক্রিটের, সামনে তুষারের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে মানুষের একটা আকৃতি। আরও কাছে এসে চিনতে পারল রানা। একজন মার্কিন সৈনিক কারবাইনটা এখনও আঁকড়ে ধরে আছে। বুকের কাছে পারকায় এরই মধ্যে জমাট বেঁধে গেছে রক্ত। জানে বেঁচে নেই, তবু পালস দেখে নিশ্চিত হলো রানা।

খুব সহজেই কাজটা সারতে পেরেছে জনসন। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার মানে হলো কেউই এয়ারফিল্ডে ঢুকতে পারবে না। কিন্তু জনসন ক্যাম্পের সিকিউরিটি চীফ, তাকে আসতে দেখে কিছুই সন্দেহ করেনি গার্ড। জনসন জানত, সিকিউরিটি চীফ হলেও কথায় চিঁড়ে ভিজবে না, তাই বাধা দূর করার জন্যে একেবারে কাছে এসে গুলি করেছে সে। 'এয়ারফিল্ডে পৌঁছে গেছে,' বিনয় কাছে আসতে বলল রানা। বেড়ার ওদিকে তাকিয়ে কিছুই নড়তে দেখল না। 'হ্যাঙ্গারে কপ্টার কাছে, তারই একটা নিয়ে পালাবে। এসো!'

'দু'জন গার্ড আছে হ্যাঙ্গারে,' দ্রুত বলল বিনয়। 'গার্ড-পোস্ট থেকে ফোন করতে পারি আমরা...'

গার্ড-পোস্টের ভেতরে ঢুকতে হলো না, বাইরে থেকেই দেখা গেল ফোনের তার ছেঁড়া। ছুটে এগোল রানা, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে দুধ-সাদা বিস্তারের দিকে তাকিয়ে থাকল। এয়ারফিল্ডের কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। 'গেল কোথায়!' পরমুহূর্তে দৃষ্টি কেড়ে নিল স্নো-প্লাউটা।

এখন ওটা ছোট দেখাচ্ছে, কমলা রঙের ছারপোকার মত গুটি গুটি এগিয়ে যাচ্ছে হ্যাঙ্গারের দিকে। চিৎকার করে লাভ নেই, এতদূর থেকে শুনতে পাবে না গার্ডরা। আবার ছুটতে শুরু করল রানা। বিনয়ের পায়ে বুট থাকলেও, রানা এখনও রাবার-সোল লাগানো জুতো পরে রয়েছে। সমতল বরফ লোহার মত শক্ত, দৌড়াতে কোন অসুবিধে হলো না। কয়েক মিনিট প্রাণপণে দৌড়াবার পর হ্যাঙ্গারের কাছাকাছি এসে পিছলে গেল পা, দড়াম করে আছাড় খেলো রানা। বিনয় কাছে পৌঁছুবার আগেই দাঁড়াতে পারল বটে, কিন্তু হাঁটতে গিয়ে দেখল পা ব্যথা করছে, রিভলভারটা কোথায় পড়েছে খুঁজে পাচ্ছে না।

আলগা খানিকটা বরফের ভেতর অর্ধেক মুখ লুকিয়ে রয়েছে রিভলভার, দেখতে পেয়ে তোলার জন্যে ঝুঁকল রানা, যান্ত্রিক একটা গুঞ্জন শুনে শিরশির করে উঠল ঘাড়ের পিছনটা। হ্যাঙ্গারের ভেতর হেলিকপ্টারের এঞ্জিন চালু হয়ে গেছে।

হাতে রিভলভার নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটল রানা, হ্যাঙ্গার এখনও দুশো গজ দূরে। 'পিছনে থাকো!'

হ্যাঙ্গারের মুখের কাছাকাছি পার্ক করা রয়েছে প্লাউটা, বিদ্যুৎ চালিত বিশাল দরজাটা এখন খোলা। হ্যাঙ্গারের মুখ প্রকাণ্ড কালো একটা গহ্বর। মুখ থেকে দশ গজ দূরে রানা, এইচ-নাইনটিন সিকোরস্কি গাঢ় ছায়ার ভেতর থেকে চাঁদের আলোয় বেরিয়ে এল। বন বন করে ঘুরছে ব্লেডগুলো। তুষার আর বরফের কুচি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, দ্রুত রানার দিকে ধেয়ে এল যান্ত্রিক ফড়িংটা।

দু'পা একটু ফাঁক করে শক্ত হয়ে দাঁড়াল রানা। লক্ষ্য যাতে ব্যর্থ না হয়, দু'হাতে রিভলভার ধরেছে ও। দশ সেকেন্ডের মধ্যে

ওকে পিষে এগিয়ে যাবে হেলিকপ্টার। ককপিটের দিকে রিভলভার তাক করেছে রানা, হেলমেট পরা পাইলটের কাঁধ আর মাথা ঝাপসা লাগল চোখে। বুক ভরে বাতাস টানল ও, তারপর ট্রিগার টেনে দিল। ক্লিক আওয়াজটা শুনতে পেল না, অনুভব করল—কপ্টারের গর্জন হাতুড়ির বাড়ির মত ঘা মারছে কানে। ফায়ারিং মেকানিজম কাজ করছে না, গুলি বেরুবে না।

'লুক আউট!' বিনয়ের আর্তনাদ যান্ত্রিক আওয়াজের ভেতর হারিয়ে গেল।

কপ্টারটাকে সোজা রানার দিকে ছুটিয়ে আনল জনসন। একপাশে ডাইভ দিল রানা, বরফে কাঁধ দিয়ে পড়ল, পড়েই গড়িয়ে দিল শরীরটাকে। অশরীরী গর্জন গ্রাস করল ওকে। খক খক করে উঠল মটর, বদলে গেল আওয়াজটা। শেষ গড়ানটা দিয়ে মুখ তুলে রানা দেখল এরইমধ্যে ছয়-সাত মানুষ উঁচুতে উঠে গেছে কপ্টার। বসল রানা, হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে কাপড় থেকে তুষার আর বরফের কুচি ঝাড়ল। পাশে এসে দাঁড়াল বিনয়। রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে স্নো-প্লাউটার দিকে তাকাল সে। প্লাউ-এর ব্লেডের তলায় অর্ধেক বেরিয়ে আছে লোকটা, গার্ডদের একজন। এই খুনটাও খুব সহজে সারতে পেরেছে জনসন। গ্রীনল্যান্ড এয়ারফিল্ডের স্নো-প্লাউ কোন অপরিচিত জিনিস নয়, ওটাকে এগিয়ে আসতে দেখে হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে আসে গার্ড। স্নো-প্লাউটা সোজা তার ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয় জনসন।

হ্যাঙ্গারের ভেতর ঢুকে হোঁচট খেলো রানা। আরেকটু হলে দ্বিতীয় গার্ডের লাশের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত। ঠিক কি ঘটেছে কল্পনা করতে পারল ও। এক ছুটে হ্যাঙ্গারের ভেতর ঢুকে চিৎকার

জুড়ে দেয় জনসন, 'ভয়ঙ্কর একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে!' তাকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে ছুটেছিল লোকটা, জনসন ঘ্যাঁচ করে তার পিঠে আমূল ঢুকিয়ে দিয়েছে ছোরা।

টর্চের আলোয় ওরা দেখল, পিঠের ওপর শুধু ছোরার হাতলটা বেরিয়ে আছে। কোল্ট ফেলে দিয়ে নিহত সৈনিকের কারবাইনটা তুলে নিল রানা। তারপর আবার ছুটল।

হ্যাঙ্গারের পিছন দিকে, হুড পরানো ল্যাম্পের নিচে, আরেকটা হেলিকপ্টার রয়েছে। দেয়ালের সুইচবোর্ড থেকে একটা ইলেকট্রিক কেবল নেমে এসে মেশিনের ভেতর ঢুকেছে, কপ্টারের মটরকে গরম রাখার জন্যে। প্লাগ থেকে কেবল খুলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল রানা, দরজা খুলে কেবিনে ঢুকল। পিছু পিছু এল বিনয়।

'কোন লাভ আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

হেলমেট আর হেডসেট পাইলটের সীটেই থাকে, পারকা খুলে ফেলে সেগুলো পরল রানা। 'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি।' ওর সামনে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল–রাডার অলটিমিটার, ফুয়েল গজ, রেভ কাউন্টার, ইত্যাদি। কালেকটিভ স্টিক, কপ্টারের ওপরে ওঠা নিয়ন্ত্রণ করে, ওর বাঁ দিকে। সাইক্লিক কন্ট্রোল স্টিক, ফ্লাইটের দিক বদল নিয়ন্ত্রণ করে, ওর ডান দিকে। টুইস্ট-গ্রিপ থ্রটল, দেখতে অনেকটা মটরসাইকেল থ্রটলের মত, কালেকটিভ স্টিকটাকে আঙটার মত ঘিরে আছে। মটর চালু করল রানা।

গোটা কেবিন কেঁপে উঠল, শব্দের বিস্ফোরণ ছড়িয়ে পড়ল হ্যাঙ্গারের চারদিকে। মাথার ওপর রোটর ব্লেডগুলো থেমে থেমে ঘুরছে–স্টার্ট নেয়, থামে, স্টার্ট নেয়, থামে। তারপরই বাড়তে শুরু করল ইঞ্জিনের শক্তি। কংক্রিটের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে গড়াতে

শুরু করল চাকা।

হ্যাঙ্গার থেকে বেরিয়ে এল সিকোরস্কি। সেই সাথে দেখা গেল প্রায় তারার রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া রাডার মাস্ট। থ্রটল ব্যবহার করল রানা। হিম বাতাস কেটে পঞ্চাশ ফিট রোটর বন বন করে ঘুরছে, আওয়াজ শুনে মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে কপ্টার থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে ওগুলো। গোটা মেশিন থরথর করে কাঁপছে। কয়েক সেকেন্ড পর বরফ ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল সিকোরস্কি।

কাঁটাতারের ওপর দিয়ে উড়ে আসার সময় গার্ড-পোস্টের কাছে একটা গাড়ি দেখল ওরা। হেডলাইটের আলোয় গার্ডের লাশ দেখছে কয়েকজন লোক। তাদের একজন রাইফেল তুলল আকাশের দিকে।

হেলমেট আর হেডসেট পরে রানার পাশে অবজারভারের সীটে বসেছে বিনয়, মাউথপীসে কথা বলল সে, 'ওকি! ওরা গুলি করছে কেন!'

এঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল রাইফেলের আওয়াজ। 'কেন আবার,' হেলিকপ্টার নিয়ে দ্রুত আরও ওপরে উঠছে রানা। 'মরিসনের ধারণা এখানে জনসন আছে।'

প্রায় খাড়াভাবে উঠে রাইফেল রেঞ্জের বাইরে চলে এল ওরা। দিগন্তে প্রথম সিকোরস্কির কোন হদিস নেই। পুব দিকে কোর্স বদল করল রানা, ওর ধারণা ওদিকেই যাবার কথা জনসনের।

'মরিসন কে?'

'এফ.বি.আই. এজেন্ট,' বলল রানা। 'কাঁকড়াকে গ্রেফতার করতে এখানে আসা তার। কথা ছিল বোয়িং থেকে নেমে কমান্ডার টেনিসনকে নিয়ে সরাসরি ক্যাম্পে যাবে সে, তারপর আমাকে

নিয়ে জনসন ক্যাম্পে পৌঁছুলে একটা বৈঠকে বসা হবে। মরিসনের ধারণা ছিল, কয়েকজনকে জেরা করলেই কাঁকড়ার আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে।' পুব দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় গোটা আকাশ ফাঁকা দেখল রানা।

'কি ঘটল?'

'মরিসনকে দেখেই যা বোঝার বুঝে নেয় জনসন,' বলল রানা। 'জরুরী অবস্থা ঘোষণা করায় সন্দেহ তার আগেই হয়েছিল। কাজেই কেটে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে।'

'ওদিকে, রানা!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল বিনয়। 'উত্তরে!'

বাঁ দিকে তাকাল রানা। আরও অসংখ্য আইসক্যাপ–নির্জন, ঠাণ্ডা, ফাঁকা। তারপর চোখে পড়ল। জনসনের কপ্টার, আন্দাজ করল রানা, দশ মাইল দূরে। বরফ থেকে খানিকটা উঁচুতে, আবছা অন্ধকারে দ্রুত ধাবমান আলোর একটা নিবু নিবু কম্পন। স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা। কয়েক সেকেন্ড পর বরফের ওপর প্রথম হেলিকপ্টারের ছায়া দেখল ওরা। কোর্স বদল করল রানা। শুরু হলো ধাওয়া।

'তোমার মেসেজ পেয়ে আমরা কিন্তু...'

'হ্যাঁ, মেসেজে সব কথা বলা সম্ভব ছিল না,' বিনয়কে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'বলতে পারো, এই অ্যাসাইনমেন্টে আমেরিকাকে, সোজা কথায় সি.আই.এ-কে আমরা পাল্টা আঘাত করতে যাচ্ছি।'

'হোয়াট!'

'সব শুনলে বুঝতে পারবে।' সংক্ষেপে, কিন্তু কিছু বাদ না দিয়ে যা যা ঘটেছে সব বলে গেল রানা।

রানা থামতে বিনয় বলল, 'রাশিয়ানরাও চাইছে ইভেনকো রুস্তভকে আমরা নিয়ে আসি, তারমানে ওরা আমাদের বাধা দেবে না...?'

'বাধা দেবে, তবে সেটা হবে লোক-দেখানো–অন্তত আমি তাই আশা করছি,' অন্যমনস্কভাবে বলল রানা। মনে মনে ভাবল, ওরাও কোন প্যাঁচ কষছে কিনা সময়েই তা জানা যাবে।

'কিন্তু রানা,' অবাক হলো বিনয়, 'রুশদের আমরা সাহায্য করছি, তাই না? তাই যদি হয়, জনসনকে পালিয়ে যেতে দিলেই তো পারি! ধরার দরকারটা কি!'

'সাহায্য আমরা কে.জি.বি-কে করছি বিনয়,' ভুলটা ধরিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'জনসন কে.জি.বি. এজেন্ট নয়, স্পেশাল সিকিউরিটি সার্ভিসের লোক। স্পেশাল সিকিউরিটি অতীতে আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে, সুযোগ পেলে ভবিষ্যতেও করবে। তাছাড়া, জনসনের সাথে এটা আমার ব্যক্তিগত বোঝাপড়া।'

গম্ভীর এবং চিন্তিত দেখাল বিনয়কে। 'ব্যাপারটা জটিল লাগছে, রানা। আমার জানা মতে, কে.জি.বি. আর এস.এস.এস. দুটো প্রতিষ্ঠানই যার যার গোপন ব্যাপারে অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর, কেউ কাউকে কোন তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে চায় না। জন মিলার, যে তোমাকে ইভেনকো রুস্তভকে এন.পি. সেভেনটিন থেকে নিয়ে আসার অনুরোধ করেছে, সে কে.জি.বি-র লোক, কিন্তু আর্কটিকে রুশ ঘাঁটিগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে স্পেশাল সার্ভিস।'

'আর্কটিকে স্পেশাল সার্ভিস কাজ করছে তা সত্যি,' বলল রানা। 'কিন্তু দেশ-বিদেশের সমস্ত ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার

রয়েছে একমাত্র কে.জি.বি-র। কে.জি.বি. নির্দেশ দিলে সেটা স্পেশাল সার্ভিস মানতে বাধ্য।'

বিনয় আর কিছু বলল না বটে, কিন্তু কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় ভাব প্রকাশ করল। রানার কোল থেকে নাইটগ্লাসটা তুলে নিয়ে চোখে চেপে ধরল সে। 'এখনও উত্তর দিকেই যাচ্ছে জনসন।'

জনসনের হেলিকপ্টার কখনও রানা দেখছে কখনও দেখছে না, তবে বরফের ওপর ছায়াটা একবারও হারায়নি। 'সম্ভবত হামবোল্ডট গ্লেসিয়ারের দিকে যাচ্ছে ও। কারণটা বুঝছি না। পুবদিকে গেলে উপকূল পেত। কোথাও থেকে ফিরে এসে ল্যান্ড করার সাথে সাথে ট্যাংক ভরে দেয়া হয়, কাজেই ফুয়েল কোন সমস্যা হবার কথা নয়। হামবোল্ডট গ্লেসিয়ারে কি আছে!'

'ওদিকে কোথাও হয়তো একটা ট্র্যান্সমিটার লুকানো আছে,' বলল বিনয়।

'সম্ভব,' বলল রানা। 'তা যদি থাকে, লেনিনগ্রাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে ও।'

'কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভের সাথে?'

'লোকটা আমার সম্পর্কে জানে,' তিক্ত একটু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'আমিও তার সম্পর্কে জানি। কেউ আমরা কাউকে দেখিনি। অথচ স্পেশাল সিকিউরিটির প্রতিটি এজেন্টের ওপর কর্নেল বলটুয়েভের নির্দেশ আছে, আমাকে দেখা মাত্র খুন করতে হবে। পুরস্কার–একসাথে তিনটে প্রমোশন।'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিনয় জিজ্ঞেস করল, 'কারণ?'

'রাশিয়া থেকে আমার মিগ-একত্রিশ নিয়ে আসাটাকে সবাই সহজভাবে নেয়নি, বিনয়,' বলল রানা। 'কর্নেল বলটুয়েভের

ধারণা, রুশ এয়ারফোর্স, রুশ সামরিক বাহিনী, এক কথায় গোটা রুশ জাতিকে দুনিয়ার চোখে আমি ছোট করেছি।'

খানিক গুম হয়ে থাকার পর বিনয় জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে জনসন তোমাকে সুযোগ পেয়েও খুন করল না কেন?'

হেসে উঠল রানা। 'কে বলল চেষ্টা করেনি?'

'বাঁট দিয়ে মাথায় না মেরে গুলি করলেই তো পারত!'

'তোমার রিভলভারের ট্রিগার আমিও তো টানলাম, কিন্তু গুলি কি বেরুল?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ভুলে যেয়ো না, এটা গ্রীনল্যান্ড, বিলো ফরটি ডিগ্রী টেমপারেচার। ট্রিগার টানার পর গুলি নাও বেরুতে পারে, জানত জনসন–জানত, তারপর আর সুযোগ পাবে না সে, ওকে কাবু করে ফেলব আমি। তাই কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি। প্রথমে আমাকে আহত করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিল।'

'বুঝেছি! তোমাকে আহত করে বরফে নামিয়ে গুলি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি পৌঁছে গেছি দেখে সুযোগটা হারায়।'

রানা কিছু বলল না।

বিনয় আবার বলল, 'তারমানে গোটা অ্যাসাইনমেন্টের চেহারা বদলে যাচ্ছে। কে.জি.বি-র নির্দেশ যদি পেয়ে থাকে কর্নেল বলটুয়েভ, ইভেনকো রুস্তভকে আমেরিকায় পালিয়ে আসতে দেবে সে। কিন্তু তোমাকে খুন করার সুযোগ হাতছাড়া করবে না।'

রানা বলল, 'আমারও তাই বিশ্বাস।'

ওদের হেলিকপ্টার যত কাছাকাছি হলো, ধীরে ধীরে উন্মোচিত হলো বিস্ময়কর হামবোল্ডট গ্লেসিয়ার। বহু উঁচু আইসক্যাপ থেকে

বিশাল এক নদী বিস্তৃত হয়ে নেমে এসেছে অনেক নিচের খাঁড়িতে, চকমকে বরফ নিয়ে আধ মাইল চওড়া একটা নদী, চাঁদের আলোয় সহস্র ফাটল ধরা স্ফটিকের বিস্তার যেন। আইসক্যাপ থেকে প্রায় খাড়াভাবে নেমেছে ওটা, তারপর বরফ-প্রাচীরের মাথা থেকে জল-প্রপাতের আকৃতি নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে কয়েকশো ফিট নিচের খাঁড়িতে পড়েছে। আরও কাছে এসে ওরা দেখল, বরফের খাড়া পাঁচিল ঘেরা খাঁড়ির নিচে, নিরেট তীরের কাছাকাছি, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেকগুলো আইসবার্গ। এরই মধ্যে জনসনের হেলিকপ্টার ল্যান্ড করেছে, গ্লেসিয়ারের পাশের একটা ছোট বরফ-পাহাড়ের মাথায়। কিন্তু জনসনকে কোথাও দেখল না ওরা। তৃতীয়বারের মত অদৃশ্য হয়েছে সে।

বসে থাকা কপ্টারকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে রানা। ‘কি জ্বালা, বারবার শুধু হারিয়ে যায়।’

‘হয়তো কপ্টারের ভেতরই ঘাপটি মেরে বসে আছে,’ বলল বিনয়। ‘আমরা ল্যান্ড করলেই টার্গেট প্র্যাকটিস করবে।’

দুশো ফিট ওপরে থেকে চক্কর দিচ্ছে রানা। গ্লেসিয়ারের খাড়া কিনারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচ্ছন্ন বোধ করল ও, বারবার ঘুরে উঠতে চায় মাথা। হঠাৎ কপ্টার একদিকে কাত করল ও। ‘দেখেছি ওকে!’ বিনয়ের এয়ারফোনে বিস্ফোরিত হলো রানার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। ‘গ্লেসিয়ারের আরও নিচে, ছোট একটা ঢিবির মাথায়। ওই দেখো, নড়ছে...’

‘নামো ঢিবিতে।’

‘পিচ্চি–কিনারা থেকে খসে পড়তে পারি,’ বলল রানা। ‘তারচেয়ে প্রথমটার পাশেই নামি, তাহলে আর বাছাধনকে

পালাতে হবে না। ল্যান্ড করার পর তুমি কিন্তু বেরুবে না। আমাকে যদি ফাঁকি দেয়, তোমার ওপর দায়িত্ব থাকবে। থিউল-এর সাথে যোগাযোগ হয় কিনা দেখো দেখি।'

পাঁচবার চেষ্টা করেও রেডিও যোগাযোগ সম্ভব হলো না। 'দরকারের সময়ে যদি কোন কাজে আসে!' বিরক্তি প্রকাশ করল রানা। ছোট পাহাড়ের ওপর, প্রথম কপ্টারের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে, নিরাপদে ল্যান্ড করল ওরা। প্রথম কপ্টারটাকে কেমন যেন পরিত্যক্ত লাগল, জনসন যেন ওটার কাছে আর ফিরে আসবে না বলেই গেছে।

সুইচ অফ করল রানা। 'আশা করি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসতে পারব, বিনয়।' দ্রুত পারকাটা পরে নিল ও।

মাথা ঝাঁকাল বিনয়, মনে মনে জানে জনসনের কাছে রাইফেল থাকলে এক ঘণ্টার অনেক আগেই মারা যাবে রানা। কিন্তু অযথা কথা বলা স্বভাব নয় তার। সে জানে, রানা একটা কাজে যাচ্ছে। কাজটা করতে গিয়ে কি ঘটবে না ঘটবে সেটা তর্ক করার বিষয় নয়।

কেবিনের ভেতরটা খুব গরম, এক হাতে কারবাইন নিয়ে দরজা খোলার সময় নিজেকে শক্ত করল রানা। এক নিমেষে ঝপ্ করে নেমে এল টেম্পারেচার—প্লাস ফরটি থেকে মাইনাস ফরটিতে। লাফ দিল রানা, নিরেট বরফ হাতুড়ির বাড়ি মারল পায়ের তলায়। অসাড় করা ঠাণ্ডায় দম বন্ধ হয়ে এল। পারকাটা গলা পর্যন্ত তুলে বাঁধল ও, হুড দিয়ে মাথা ঢাকল। পিছনে তাড়াহুড়ো করে দরজা বন্ধ করে দিল বিনয়। রানার সাথে কাজ করার সময় এই নিয়মটা মেনে চলে বিনয় আর নিয়াজ, অযথা

কথা বলে এনার্জি নষ্ট করে না। রানার মাথার ওপর ব্লেডগুলো এখন আর ঘুরছে না। আর্কটিক রাতের শীতল নিস্তব্ধতা চেপে ধরল ওকে।

খুদে পাহাড়ের কিনারায় বসে রয়েছে জনসনের হেলিকপ্টার, ছোট ছোট নিঃশ্বাস ফেলে সেটাকে পাশ কাটাল রানা। কিনারায় দাঁড়িয়ে ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যাওয়া গ্লেসিয়ারের বিশাল ঢালের দিকে তাকাল ও। গ্লেসিয়ারের আরও অনেক নিচে দ্বিতীয় ঢিবিটা চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল, উল্টো করা পেয়ালা আকৃতির পাথর, মাথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পোঁতা রয়েছে কর্কশ কাঠের কয়েকটা ক্রস চিহ্ন। একটা এস্কিমো কবরের ওপর দাঁড়া মত কি যেন রয়েছে, সেটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে জনসন। গ্রীনল্যান্ডে এস্কিমোদের কবর অত্যন্ত পবিত্র জায়গা বলে মনে করা হয়, ডেনিশ কর্তৃপক্ষের কঠোর নির্দেশ কোন অবস্থাতেই কবরের পবিত্রতা নষ্ট করা চলবে না। দাঁড়াটা খাড়া করল জনসন, এতক্ষণে রানা দেখল দাঁড়া নয়, ওটা আসলে একটা এরিয়াল, বাক্স আকৃতির ট্র্যান্সমিটার থেকে বেরিয়ে রয়েছে।

গ্লেসিয়ারের পাথরের পাশটা বড় বেশি খাড়া, এ-পথে নিচে নামা রানার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই গ্লেসিয়ারের বরফ ঢাল বেয়ে নামতে হবে ওকে। হাত দুটো দু'পাশে মেলে দিল রানা, এক হাতে কারবাইন। ধীরে ধীরে, টলমল করতে করতে শুরু হলো নামা। চাঁদের আলো যথেষ্ট নয়, এত দূর থেকে গুলি করলে লাগানো প্রায় অসম্ভব। ঢালের গায়ে হাজারো ফাঁদ। নিরেট মনে করে পা ফেলছে রানা, হুস করে তুষারে ডুবে যাচ্ছে গোড়ালি। কোথাও বরফের গা এত মসৃণ আর পিচ্ছিল যে ঘুর পথে এগোতে

হলো। ঢালটা সোজাসুজি নেমে যায়নি, কাত হয়ে আছে একদিকে। একবার যদি পিছলাতে শুরু করে, থামার যো থাকবে না, ঢালের কিনারায় পৌঁছে যাবে, প্রপাতের সাথে কিনারা থেকে নেমে যাবে কয়েকশো ফিট নিচের খাঁড়িতে।

রানা সাবধান, তবু যত দ্রুত সম্ভব নামতে চেষ্টা করছে। ও চায় না, এস.এস.এস. হেডকোয়ার্টার লেনিনগ্রাদের সাথে যোগাযোগ করুক জনসন।

রানা আরও খানিক নিচে নামার পর ঢিবির আড়ালে হারিয়ে গেল জনসন। যত নিচে নামল রানা, বিপদের আশঙ্কা বাড়ল তত। মাঝে মাঝেই ফাঁক হয়ে গেছে গ্লেসিয়ার, মুখ ব্যাদান করে আছে ছোট বড় অসংখ্য ফাটল, কিনারা থেকে নিচের দিকে গাঢ় ছায়ার ভেতর হারিয়ে গেছে ফাটলের দেয়াল, কেউ জানে না কোন্ অতলে। আরও সাবধান হয়ে গেল রানা। কারবাইনের ব্যারেল দিয়ে বরফের গা পরীক্ষা করে নিয়ে এক পা এক পা করে নামছে এখন। এমন অনেক ফাটল আছে যে-গুলোর মুখ খোলা নয়, বরফের পাতলা চাদর ঢেকে রেখেছে নিখুঁতভাবে। একবার পা পড়লে স্যাঁৎ করে তলিয়ে যেতে হবে। তবু একের পর এক বিপজ্জনক ঝুঁকি নিতেই হলো। সামনে পড়ল তিন হাত চওড়া খাদ, ওপারের বরফ পরীক্ষা করা সম্ভব হলো না—লাফ দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে হলো।

রানা নামছে, সেই সাথে বেদখল হয়ে যাচ্ছে গোটা শরীর। দস্তানার ভেতর, পারকার ভেতর, জুতোর ভেতর এরই মধ্যে ঢুকে কামড় বসাতে শুরু করেছে ঠাণ্ডা। জায়গায় জায়গায় সাড় পাওয়া যাচ্ছে না।

ঢিবির খুব কাছে চলে এসেছে রানা। বরফ পরীক্ষা বাদ দিয়ে কারবাইনটা কোমরের কাছে ধরে তৈরি হয়ে আছে ও। প্রকৃতির চেয়ে মানুষই এখন তার বড় শত্রু হয়ে উঠতে পারে। সামনে বিশ ফিট উঁচু ঢিবি, হঠাৎ ঢিবির আরেক প্রান্ত থেকে এদিকের মাথায় চলে এল জনসন। রানাকে বোধহয় আগেই দেখেছে সে, হাতটা মাথার ওপর তোলাই ছিল, সজোরে কি যেন ছুঁড়ে দিল রানার দিকে। গ্রেনেড মনে করে ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। এক ঝটকায় কারবাইন তুলল ও। ঢালের গায়ে পড়ল জিনিসটা, একটা পাথর। বিদ্যুৎ চমকের মত উপলব্ধি করল রানা, জনসন নিরস্ত্র।

দারুণ টিপ জনসনের, বরফে ড্রপ খেয়ে তীরবেগে ছুটে এল পাথরটা। সময়মত সরে না গেলে রানার ঠিক বাঁ পায়ে লাগত। লাফ দিয়ে সরে গেল রানা ঠিকই, কিন্তু তাল হারিয়ে ফেলল। বরফে আছাড় খাবার আগেই পিছলে গেল শরীরটা। ভারী বস্তার মত পিচ্ছিল বরফের ঢাল বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে। নিচে কিনারা, কিনারা থেকে নেমে গেছে প্রপাত, কয়েকশো ফিট নিচে।

কারবাইনটা খসে গেছে হাত থেকে। সেটার কথা এই মুহূর্তে মনেও নেই রানার। পতন ঠেকাবার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করল ও। কিন্তু সবই বৃথা। হাত নয় যেন বাঘের থাবা, কিন্তু বরফের ছাল তুলতে পারলেও ভেতরে সেঁধোল না। পতনের গতি কমিয়ে আনার জন্যে শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেলল রানা, মুখের একটা পাশ আর মাথা ঠুকল বরফের গায়ে, সরু চিড়ের ভেতর বাধাবার চেষ্টা করল পা–কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। নিমেষের মধ্যে গোটা জীবনের ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। ছেলেবেলা, কৈশোর, প্রথম প্রেম, সামরিক ট্রেনিং, প্রিয়জন,

মাতৃভূমি। ঢং ঢং বিদায়ের ঘণ্টা বাজল কানের পাশে, যেন ছুটি হয়ে গেল স্কুল। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে।

তবু আর সব সাধারণ মানুষের সাথে ওর পার্থক্য এই যে দ্বিতীয় বার মরে না ও। মৃত্যু অবধারিত জানার পরও বেঁচে থাকার চেষ্টায় কোন ত্রুটি থাকে না। পতন থামছে না, চোখে-মুখে বাড়ি খাচ্ছে হিমবাতাস, কাত হয়ে থাকা ঢাল বেয়ে সোজা না নেমে একটু তেরছাভাবে নামতে চেষ্টা করছে ও, ইচ্ছে কোন ফাটলের ভেতর পড়া।

সামনে মসৃণ বরফের গা ত্রিশ ডিগ্রী কাত হয়ে আছে। পতনের গতি আরও বেড়ে গেল, তবু গায়ে পারকা থাকায় চামড়া অক্ষত আছে।

না, সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেল। থামা তো দূরের কথা, পতনের গতি কমাতে পর্যন্ত পারল না রানা। চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি, দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যায়। ঢালের কিনারা পরিষ্কার দেখতে পেল ও, কঠিন একটা রেখা, ওপারে কিছুই নেই, ফাঁকা শূন্যতা। কিনারা থেকে ঝপ্ করে নেমে গেছে গ্লেসিয়ারের গা, কয়েকশো ফিট নিচে খাঁড়ি।

কিনারার দিকে মুখ আর মাথা, শরীরটা পিছনে। কিনারা থেকে নিচে খসে পড়ার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি রানা। হাত দুটো সজোরে মাথার দু'পাশে বরফের ওপর নামিয়ে আনল, থাবড়া মারার ভঙ্গিতে। কিনারায় পৌঁছে গেল ও। খসে পড়ছে। সীমাহীন শূন্য বিস্তার, গভীরতা, চোখা একটা কালো কি যেন মুখ ব্যাদান করে আছে ওর নিচে। বাঁ হাতে ঠেকল বোল্ডার, গ্লেসিয়ারে গাঁথা একটা চোখা পাথর।

সচেতন কোন চেষ্টা নয়, নিখাদ রিফ্লেক্স–বাঁকা হয়ে গেল আঙুলগুলো, ধরে ফেলল পাথরটাকে। পতনের গতি তাতেও রোধ হলো না। ঘুরে গেল শরীরটা, পিছলে কিনারা থেকে নেমে গেল পা সহ কোমর আর বুক। শরীরের নিচের অংশ ঝুলে পড়ায় ঝাঁকি খেলো বাঁ হাত, পাথর থেকে খুলে আসতে চাইল আঙুলগুলো। স্থির হলো শরীর, ঝুলে থাকল, কনুই ভাঁজ করা একটা মাত্র হাতের ওপর।

নিচে চট্ করে একবার তাকিয়ে কিছুই দেখল না রানা, খাড়া বরফের গা শুধু নিচ থেকে আরও অনেক নিচের দিকে নামতে নামতে হারিয়ে গেছে। সবটুকু শক্তি দিয়ে পাথরটা ধরে আছে ও। কিনারায় ওঠার চেষ্টা করল এবার। বোল্ডারটাকে ডান হাত দিয়ে পেঁচাল। দুই হাতের আঙুল আঁকড়ে ধরল পরস্পরকে। ধীরে ধীরে উঠতে চেষ্টা করল ও। বোল্ডারের ওপর দিয়ে এতক্ষণে তাকাল ঢালের দিকে। ঢাল বেয়ে নেমে আসছে জনসন।

বরফের রাজ্যে জমাট বেঁধে আছে হিম নিস্তব্ধতা, শুধু বুটের চাপ খেয়ে আলগা বরফ মুড়মুড় করে কুচি হচ্ছে। মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল রানার। জনসনের পায়ে ক্র্যাম্পন বুট, তলায় লোহার কাঁটা লাগানো, বেশ নিরাপদেই নামতে পারছে সে। কিন্তু পেল কোথায়? নিশ্চয়ই আগেই রেখে দিয়েছিল জীপে। তারমানে থিউল থেকে রওনা হবার সময়ই প্ল্যান করেছিল পালাবে। এয়ারপোর্টে পৌঁছে বোয়িং-এর জন্যে অপেক্ষা করার একটাই কারণ, রানাকে খুন করে তিনটে প্রমোশন বাগানো।

রানার কাছে পৌঁছুতে আধ মিনিটও লাগবে না জনসনের। কিনারায় ওঠার চেষ্টা বাদ দিল রানা। হঠাৎ একজন নয়, দু'জন

লোককে ঢাল বেয়ে নেমে আসতে দেখল ও। বিনয়?

পরমুহূর্তে নিজের ভুল বুঝতে পারল রানা। চোখ পিট পিট করে আরেকবার বোল্ডারের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখল, একা জনসনই, আর কেউ নেই। অর্থাৎ, দৃষ্টিভ্রম ঘটছে ওর।

জনসনের ডান হাতে একটা ছোরা। একেবারে কাছে চলে এসেছে সে, এই সময় একদিকে কাত হয়ে পড়ল রানার মাথা, বোল্ডার থেকে খসে পড়ল ডান হাত।

ডান হাতটা অসাড় হয়ে গেল, মরা সাপের মত নেমে এল বোল্ডারের পিছনে। শরীরের ভার বাঁ হাতটা আর ধরে রাখতে পারছে না, মনে হলো কাঁধ থেকে ছিঁড়ে যাবে ওটা। পারকার ভেতর দরদর করে ঘামছে রানা। বোল্ডারের কাছ থেকে তিন ফিট দূরে থামল জনসন। বুঝল এতটা দূর থেকে ছোরা নাগাল পাবে না। সাবধানে আরও দু'পা এগোল সে। উবু হয়ে পাথরটার পিছনে বসল। লোহার কাঁটাঅলা বুট তুলল সে, লক্ষ্যস্থির করল রানার দস্তানা পরা বাঁ হাতের ওপর। কাঁটাগুলো আধ ইঞ্চি লম্বা, গায়ে বরফের আবরণ।

লাথি মারল জনসন, বোল্ডারের ওপর দিয়ে উঠল রানার ডান হাত। জনসনের গোড়ালি পেঁচিয়ে ধরেই হ্যাঁচকা টান দিল। নিজের দিকে নয়, একপাশে টানল ও। ওর হাতে ঘষা খেলো কাঁটা, তাল হারিয়ে ফেলে পিছলাতে শুরু করল জনসন। বোল্ডারটাকে ঘুরে হড়কে কিনারার দিকে চলে এল সে, হাত দুটো এলোপাতাড়ি বরফের ওপর বাড়ি মারল কিছু একটা ধরতে পারবে এই আশায়। শেষ পর্যন্ত পাথরটা ধরে ফেলল, ভাবল এ-যাত্রা বেঁচে গেছে। ডান হাত দিয়ে আবার আঘাত করল রানা। এবার নির্ভেজাল বিরাশি

সিক্কার ঘুসি, দু'মুখো সাপের নাক বরাবর। হাঁ করল জনসন, নিঃশব্দে চিৎকার করল, খসে পড়ল কিনারা থেকে। গভীর খাদ থেকে উঠে এল তার আর্তচিৎকার, তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল। কিনারা থেকে নিজেকে তোলার চেষ্টা করল রানা।

বোল্ডার টপকে এসে নেতিয়ে পড়ল ও। জ্ঞান হারায়নি, তবে নড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। খানিকক্ষণ নিঃসাড় পড়ে থাকার পর বাঁ হাতটা ডলতে শুরু করল। তারপর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো, কিনার থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল নিচে।

একেই বলে দর্শনীয় মৃত্যু। কিনারা থেকে তিনশো ফিট খাড়া নেমে গেছে গ্লেসিয়ারের দেয়াল, তারপর আবার শুরু হয়েছে ঢাল। ঢালের গা থেকে ফুঁড়ে বেরিয়েছে বরফের থাম, মাথাগুলো ছুরির ডগার মত চোখা। এই রকম একটা চোখা থাম জনসনের পেট দিয়ে ঢুকে পিঠ ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। ঢাল থেকে পনেরো ফিট উঁচুতে, থামের মাথায় শেষ আশ্রয় নিয়েছে কাঁকড়া।

'নিয়ে চলো, বিনয়।'

ফাটা বেলুনের মত অবজারভারের সীটে নেতিয়ে পড়ল রানা। চেহারা বা চোখে কোন ভাব নেই, রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বিনয়। 'ট্র্যান্সমিটার ছিল?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কমান্ডার টেনিসন কাউকে পাঠিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।'

'ট্র্যান্সমিট করতে পেরেছে?'

'জানি না,' ক্লান্ত স্বরে বলল রানা। 'করলেও কিছু আসে যায় না। কর্নেল বলটুয়েভ জানবে আমরা যাচ্ছি।'

পাঁচ

লেনিনগ্রাদে শনিবার রাত আটটা। এন.পি.সেভেনটিন থেকে ইভেনকো রুস্তভ আর আট ঘণ্টা পর আই.আই. ফাইভের উদ্দেশে রওনা হবে। কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ এখনও তার অফিসে। স্টোভের আঁচে ঘরের ভেতরটা ঝলসাচ্ছে।

'ইভেনকো রুস্তভের ব্যাপারে, কর্নেল কমরেড, মাথা ঘামাবার আমি তো কোন কারণ...'

'তোমার ওটাকে তুমি মাথা বলো?' মাটিতে পা ঠুকল কর্নেল। বাধা পেয়ে ওটা (মাথাটা) নিচু করল জুনায়েভ। নিজের গম্বুজ আকৃতির কামানো মাথায় হাত বুলাল কর্নেল। 'ঘটনা ঘটার আগেই এখানে তার ছবি ফুটে ওঠে, সেজন্যেই ওই চেয়ারটায় বসতে দেয়া হয়েছে আমাকে।' আরও দ্রুত হলো তার পায়চারি। 'ক্রুদের তালিকা দেখে আমার চোখ খুলে গেছে, বুঝলে?'

'বার্জেনের ডেপুটি মেট, ইউরি রুস্তভের কথা বলছেন?'

'সুমাইয়া নাজিন নামে কোন মেয়ের কথা মনে পড়ে কিনা দেখো তো।' কর্নেল চোখ পাকাল।

'সুমাইয়া নাজিন...আমাদের এই হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসা হয়েছিল—হ্যাঁ, মনে পড়ে। সিঁড়ি থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে গিয়েছিল...'

'সেই সাথে মন ভেঙেছিল ইভেনকো রুস্তভের, তা জানো?'

'হ্যাঁ,' শান্ত গলায় বলল জুনায়েভ। 'মেয়েটাকে ভালবাসত ইভেনকো রুস্তভ।'

'সুমাইয়া ইহুদিদের আন্ডারগ্রাউন্ড সেলের একজন সদস্যা

ছিল,’ বলল কর্নেল। ‘জেরার মুখে স্বীকার করেছিল, আমেরিকা থেকে টাকা পায় তারা। আমার এখন সন্দেহ, আমেরিকানদের টাকা এখন লেনিনগ্রাদে পৌঁছে দেয় আমাদের এই খ্যাতিমান বিজ্ঞানী, ইভেনকো রুস্তভ।’

জুনায়েভ হতভম্ব হয়ে গেল। নাহ্, মনে মনে স্বীকার করল সে, কর্নেলকে বুঝতে পারা তার কর্ম নয়। ‘কিন্তু কিভাবে?’

‘তিন বছর ধরে আর্কটিকে রয়েছে সে,’ গড়গড় করে উত্তরটা আউড়ে গেল কর্নেল। ‘পোলার প্যাকের তলায় মেরিলিন সিস্টেমের কেব্‌ল্ আর সোনার বয়া পাতার কাজ করছে। আমেরিকানরা কি করছে না করছে দেখার জন্যে কয়েকবারই আই.আই. ফাইভে গেছে সে।’ পায়চারি থামিয়ে টেবিলের ওপর দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল, মেঝে থেকে আধ ইঞ্চি লাফিয়ে উঠল টেবিলটা। ‘টাকা কিভাবে হাত-বদল হয়েছে বুঝতে পারছ, জুনায়েভ? ফিরে আসার পর কেউ তাকে সার্চ করেনি।’

‘কিন্তু...’

‘চোপ!’ হুংকার ছাড়ল কর্নেল। ‘সে তার ভাই ইউরির সাথে কিয়েভে দেখা করে—ছুটি নিয়ে দু’জনেই তারা ওখানে গিয়েছিল। ইউরি এখানে ফিরে আসে নিজের জাহাজে চড়ার জন্যে, এবং পার্কে আমেরিকান ট্যুরিস্ট ডকিনসের সাথে দেখা করে। ডকিনসকে একটা মৌখিক খবর দেয় সে—নিশ্চয়ই ইভেনকোর পাঠানো কোন মেসেজ।’

‘কিন্তু, কর্নেল কমরেড, ইভেনকো রুস্তভ ইহুদি হলেও অত্যন্ত নামকরা একজন বিজ্ঞানী...’

‘জানি,’ হঠাৎ মুচকি হেসে বলল কর্নেল। ‘তাই সরাসরি এখুনি

তাকে আমরা ঘাঁটাব না। কিন্তু তার ভাই ইউরি তো আর বিখ্যাত কেউ নয়? তাকে খোঁচা মেরে দেখতে দোষ কি? বার্জেনের সামান্য একজন নাবিক, কতল করলেও কেউ নাক গলাবে না। বার্জেনের বর্তমান পজিশন জেনেছ?'

'তালিন থেকে পাঁচ ঘণ্টার পথ দূরে...'

'তালিন এয়ারপোর্টে একটা প্লেন পাঠিয়ে দাও, ইউরি ওখানে পৌঁছুলেই তাকে ধরে আনতে হবে। ট্রলার মাস্টারকে তার পাঠিয়ে নির্দেশ দাও, সোজা তালিনে পৌঁছুতে হবে। বন্দরে পৌঁছুবে পাঁচ ঘণ্টায়, এয়ারপোর্ট থেকে বন্দরে যেতে-আসতে আধ ঘণ্টা, প্লেন এখানে ফিরে আসতে আরও এক ঘণ্টা। সাত ঘণ্টার মধ্যে এই অফিসে ইউরিকে চাই আমি, রোববার সকাল তিনটের সময়। জুনায়েভ, এখনও তুমি দাঁড়িয়ে আছ কি মনে করে?' সহকারীর দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল সে।

একা হওয়া মাত্র পকেট সংস্করণ দাবা নিয়ে বসে পড়ল কর্নেল। নতুন একটা সমস্যার সমাধান পেতে হবে তাকে।

দযেরঝিনস্কি স্কয়ার, কে.জি.বি. হেডকোয়ার্টার।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বলতে হবে, অতি গোপনীয়তাই হিতে বিপরীত ডেকে আনল। শুধু তাই নয়, নিয়ম ভাঙা যে কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধ, অকস্মাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়ে সেটা আরেকবার প্রমাণ করে গেলেন জেনারেল পিটার কুরাডিন।

শুরু থেকে সুষ্ঠুভাবেই এগোচ্ছিল কাজটা। স্পেশাল সিকিউরিটিতে কে.জি.বি.-র লোক আছে, তার কাছ থেকেই জেনারেল কুরাডিন প্রথম আভাস পান ইভেনকো রুস্তভ দেশ ত্যাগ

করে আমেরিকায় পালিয়ে যেতে পারে। তাঁর উচিত ছিল, স্পেশাল সিকিউরিটির কর্নেল বলটুয়েভকে ব্যাপারটা জানানো, কিন্তু তা না জানিয়ে গোপনে ইভেনকো রুস্তভের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেন তিনি।

কর্নেল বলটুয়েভ তখন মস্কোয়, আর্কটিক থেকে ছুটি নিয়ে স্পেশাল সিকিউরিটির হেডকোয়ার্টার লেনিনগ্রাদে আসে ইভেনকো রুস্তভ। মেরিলিন চার্টের একটা কপি আছে ওখানে, সেটা দেখার জন্যে নিয়ে প্রতিটি শীটের ফটো তোলে সে। গোটা মেরিলিন সিস্টেমের প্ল্যান তারই করা, কাজেই চার্টটা দেখতে চাইলে কর্নেল বলটুয়েভের সহকারী জুনায়েভ তাকে বাধা দেয়নি।

মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্ম নিয়ে আর্কটিকে, এন.পি.সেভেনটিনে ফিরে যায় ইভেনকো রুস্তভ। ওখানে কে.জি.বি.-র এজেন্ট আছে, জেনারেল কুরাডিনের নির্দেশ পেয়ে মাইক্রোফিল্ম বদলের কাজটা নিখুঁতভাবে সারে সে। ইভেনকো রুস্তভ তখন তার ঘরে ছিল না, ভেতরে ঢুকে আসল মেরিলিন চার্টটা খুঁজে বের করে সে, সেটা পকেটে ভরে তার জায়গায় নকল আরেকটা চার্টের মাইক্রোফিল্ম রেখে আসে।

মেরিলিন চার্ট চুরি বা পাচার হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় আগেই নকল অনেকগুলো চার্ট তৈরি করে রাখা হয়েছিল, সবগুলোই দেখতে প্রায় এক রকম। নকলগুলো তৈরি করেছে তরুণ কিছু বিজ্ঞানী, এবং এগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে ইভেনকো রুস্তভকে কিছুই জানতে দেয়া হয়নি। তরুণ বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বই বলতে হবে, দেখার সুযোগ পেলে ইভেনকো রুস্তভেরও ওগুলোকে নকল বলে সন্দেহ করতে প্রচুর সময় লেগে যাবে।

মাইক্রোফিল্ম বদল সম্ভব হয়েছে, এই খবর পেয়ে মস্কোয় বসে খুশিতে বগল বাজাতে শুরু করলেন জেনারেল কুরাডিন। কাজ শেষ করে মস্কোয় ফিরে এল তাঁর এজেন্ট, নতুন দায়িত্ব দিয়ে ফিনল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হলো তাকে।

জেনারেল কুরাডিনের অধীনে অন্তত ছয়জন কে.জি.বি. এজেন্ট শুধু আমেরিকাতেই কাজ করছে। তার মধ্যে জন মিলার একজন। কোডেড মেসেজের সাহায্যে এই ছয়জনের সাথে যোগাযোগ রাখেন জেনারেল। এই কোড তাঁর নিজস্ব আবিষ্কার, তিনি আর তাঁর ছয়জন এজেন্ট ছাড়া আর কারও পক্ষে তা ভাঙা সম্ভব নয়।

ওয়াশিংটন থেকে জন মিলারের প্রথম অয়্যারলেস মেসেজ পেলেন জেনারেল, আমেরিকানরা ইভেনকো রুস্তভকে এন.পি.সেভেনটিন থেকে নিয়ে আসার প্ল্যান করছে। কোড ভেঙে মেসেজটা পড়লেন জেনারেল, তারপর পুড়িয়ে ফেললেন। নিয়ম ভাঙাই তাঁর নিয়ম, কোন মেসেজই কোথাও টুকে রাখেন না। তিনি অবশ্য ফটোগ্রাফিক মেমোরি-র অধিকারী, একবার যা শোনেন বা দেখেন, জীবনে কখনও ভোলেন না।

জন মিলারকে মেসেজ পাঠিয়ে জানিয়ে দেয়া হলো, কে.জি.বি-ও চাইছে ইভেনকো রুস্তভ পালিয়ে যাক।

এরপর দ্বিতীয় মেসেজে জন মিলার জেনারেল কুরাডিনকে জানাল, ইভেনকো রুস্তভ আমেরিকানদের বরফ-দ্বীপ আই.আই.ফাইভে আসবে, সেখান থেকে তাকে তুলে আনবে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম এজেন্ট মাসুদ রানা। মিলার আরও জানাল, আমেরিকানরা গায়ের জোরে রানাকে দিয়ে

কাজটা করিয়ে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু রানাকে রাজি করাতে পারেনি, রানা শুধু আমেরিকানদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তার অনুরোধে রাজি হয়েছে।

এ ঘটনা শনিবার সন্ধ্যার। এর আগের মেসেজগুলোর মত এই শেষ মেসেজটাও ছিঁড়লেন জেনারেল, তারপর পুড়িয়ে ফেললেন। বুকে চিন চিনে ব্যথা নিয়ে আপনমনে হাসতে লাগলেন তিনি। মঞ্চ সাজানো হয়ে গেছে, এখন যে যার ভূমিকায় সুষ্ঠুভাবে অভিনয় করে গেলেই তাঁর মনের আশা পূরণ হয়। এক ঢিলে কয়েকটা পাখি মারার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। কর্নেল বলটুয়েভ তাঁর চির প্রতিদ্বন্দ্বী, এক হাত নেয়া যাবে তাকে। বেঈমান ইহুদিটা ভাবছে আমেরিকায় একবার পৌঁছুতে পারলেই সবাই তাকে জামাই আদর করবে, কিন্তু সে গুড়ে বালি। মাইক্রোফিল্ম যে নকল, দু'দিন আগে বা পরে ঠিকই টের পাবে সে। তখনই শুরু হবে তার উভয় সঙ্কট। মাইক্রোফিল্ম নকল এটা স্বীকার করা তার পক্ষে কঠিন হবে, কারণ তাহলে আর আমেরিকানদের কাছে তার কোন মূল্য থাকবে না। আবার স্বীকার না করলেও বিপদ, কারণ নকল মেরিলিন চার্ট ব্যবহার করে আমেরিকানরা আর্কটিকের তলায় অনন্তকাল অপেক্ষা করলেও সোভিয়েত রাশিয়ার কোন সাবমেরিনের দেখা পাবে না। অনন্তকাল নয়, কিছুদিন পরই ওদের মনে সন্দেহ জাগবে। ধীরে ধীরে টের পাবে তারা, মস্ত একটা ঠক্ দিয়েছে তাদেরকে কে.জি.বি.।

আনন্দে এতই আত্মহারা হলেন জেনারেল, বুকের ব্যথাটাকে আমলই দিলেন না। সারা শরীরে পুলক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা ভাবলেন তিনি। সব কিছু এখন নির্ভর করছে

ইভেনকো রুস্তভকে আই.আই. ফাইভে যেতে দেয়ার ওপর। কিন্তু তাকে যদি কোন রকম বাধা দেয়া না হয়, যদি ধাওয়া না করা হয়, আমেরিকানরা সন্দেহ করবে। অর্থাৎ বাধা দেয়ার ভান করতে হবে।

নর্থপোলে কে.জি.বি-র কোন নেটওঅর্ক নেই। কাজটা স্পেশাল সিকিউরিটির। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন জেনারেল। কর্নেল বলটুয়েভের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবেন তার স্পেশাল সিকিউরিটির ওপর টেক্কা দিয়েছে কে.জি.বি, তারপর সব ঘটনা খুলে বলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন।

সবার অলক্ষ্যে মিটিমিটি হাসছিলেন তিনি। বিধাতার এই স্বভাবটা মানুষের কল্পনা মাত্র হলেও, কেন যেন মনে হয় মানুষ যা আশা করে তার ঠিক উল্টোটা ঘটিয়ে সত্যি বুঝি মজা পান তিনি।

জেনারেল কুরাডিন ঠিক করলেন, অয়্যারলেস রূমে গিয়ে মেসেজটা নিজে পাঠাবেন। কিন্তু চেয়ার ছাড়তে গিয়ে বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করলেন, সেই সাথে ঘুরে উঠল মাথা। বন্ধ ঘরের ভেতর, সকলের অগোচরে, তিন মিনিট পর মারা গেলেন তিনি।

জন মিলার জানল না, জেনারেল কুরাডিন মারা গেছেন।

কর্নেল বলটুয়েভ জানল না, ইভেনকো রুস্তভ আমেরিকায় চলে যাবার প্ল্যান করেছে, এবং তাকে যেতে দিতে হবে।

রানা জানল না, ভান নয়, রাশিয়ানরা ওর ওপর সত্যি সত্যি হানবে মরণ-আঘাত।

‘কাঁকড়ার কাছ থেকে এইমাত্র একটা মেসেজ এসেছে।’ আধঘণ্টা পর কর্নেলের অফিসে ফিরে এসে রিপোর্ট করল জুনায়েভ। ‘কোড

ভাঙছে ওরা।' লক্ষ করল, টেবিলে বসে গভীর মনোযোগের সাথে ইভেনকো রুস্তভের ফাইলটা পড়ছে কর্নেল।

ফাইল থেকে মুখ না তুলেই কর্নেল জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু?'

'না। কাঁকড়া কে, কর্নেল কমরেড?'

'একজন এজেন্ট, শুধু আমিই তাকে চিনি। ডিকোড করার সাথে সাথে মেসেজটা দেখতে চাই আমি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরই ফিরে এল জুনায়েভ। কর্নেলের হাতে ধরিয়ে দিল সে মেসেজটা।

ন'টা বাজে। এরই মধ্যে কোর্স বদলে তালিনের দিকে রওনা হয়েছে ট্রলার বার্জেন। জুনায়েভ যে প্লেনটা পাঠিয়েছে আর দশ মিনিট পর তালিন এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করবে সেটা।

ওয়াশিংটনের ঘড়ির কাঁটা লেনিনগ্রাদের চেয়ে আট ঘণ্টা পিছিয়ে আছে, ডকিনসের মেসেজ আসছে না দেখে নিজের অফিসে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন জেনারেল ফচ। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে টমাস। এখনও তারা জানে না ডকিনস মারা গেছে। রানাকে আসলে মিথ্যে কথা বলা হয়েছে, টমাসকে সাসপেন্ড করা হয়নি। রানা ওয়াশিংটন ত্যাগ করার পরপরই জেনারেলের অফিসে ফিরে এসেছে সে।

গ্রীনল্যান্ডের ঘড়ির কাঁটাও লেনিনগ্রাদের চেয়ে আট ঘণ্টা পিছিয়ে আছে, হামবোল্ডট গ্লেসিয়ার থেকে ফিরে আসছে রানা আর বিনয়।

জনসন ওরফে কাঁকড়ার মেসেজ এইমাত্র কর্নেল বলটুয়েভের হাতে পৌঁছুল।

'ডিকোড করতে হিমশিম খেয়ে গেছে ওরা,' ব্যাখ্যা করল জুনায়েভ। 'মেসেজটা কেমন যেন এলোমেলো...'

পড়া শেষ করল কর্নেল। মন্তব্য করল, 'চমৎকার!' কামানো মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে দ্বিতীয়বার পড়ল মেসেজটা। 'আমেরিকানরা প্রস্তুতি নিচ্ছে...আই.আই. ফাইভ থেকে রওনা হতে যাচ্ছে মাসুদ রানা...কার্টিস ফিল্ডে আমেরিকান প্লেন...রানার সাথে একটা দল রয়েছে...পোলার প্যাকের ওপর দিয়ে যাবে ওরা...সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে...'

উঠে দাঁড়াল কর্নেল, পাশের ঘরের দিকে এগোল। তার পিছু নিল জুনায়েভ। পাশের ঘরে টেলিপ্রিন্টার, অয়্যারলেস, টেলিফোন, ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্তভাবে কাজ করছে কিছু লোক। ভেতরে ঢুকে সোজা ওয়াল-ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কর্নেল।

জেনারেল ফচ আর কর্নেল বলটুয়েভের ওয়াল-ম্যাপ প্রায় একই রকম দেখতে, এটায় শুধু আর্কটিক এলাকাটাকে অন্যভাবে দেখানো হয়েছে। মেঝের কাছাকাছি রয়েছে রাশিয়ান উপকূল; গ্রীনল্যান্ড, কানাডা, আর আলাস্কা উপকূল সিলিঙের কাছাকাছি। 'এটা কার্টিস ফিল্ড,' হাতের টোবাকো পাইপ তাক করে জুনায়েভকে দেখাল কর্নেল। 'আই.আই. ফাইভের সবচেয়ে কাছের এয়ারফিল্ড।' ডেস্কের পিছনে বসা এক লোককে ডাকল সে। 'বদোনভ, এলাকায় জাহাজগুলোর পজিশন বলো আমাকে।'

'ট্রলার ফ্লীট এম. সিক্সটি-নাইন, কর্নেল কমরেড?'

'ওটা দিয়েই শুরু করো।'

'যেমন দেখছেন, কর্নেল কমরেড, এই মুহূর্তে আইসল্যান্ডের অনেক উত্তরে রয়েছে ফ্লীটটা, তবে দক্ষিণ দিকে

এগোচ্ছে—উদ্দেশ্য, ন্যাটো-র ওয়াটার কিং যে মহড়ার পরিকল্পনা করেছে সেটার ওপর নজর রাখা। আমাদের ফ্লীটে বারোটা জাহাজ রয়েছে, প্রত্যেকটি নরমাল ইলেকট্রনিক গিয়ারে সাজানো...'

'অয়্যারলেস-জ্যামিং অ্যাপারাটাস সহ?'

'জ্বী, কর্নেল কমরেড। স্পিট বার্জেনের পশ্চিম থেকে হেলিকপ্টার-ক্যারিয়ার নার্ভা-ও একই মিশনে দক্ষিণ দিকে ঘুরে গেছে...'

'আর রিগা? ওটাই তো আইসবার্গ অ্যালি-র সবচেয়ে কাছে।'

'রিগা এখন কয়েক হপ্তা ওখানেই থাকবে। আমেরিকান উপগ্রহগুলোর ওপর নজর রাখছে...'

আরও ওপরের একটা চিহ্নের ওপর পাইপ ঠেকাল কর্নেল। 'আর এই আমেরিকান জাহাজটা...?'

'আইসব্রেকার কিউট, কর্নেল কমরেড। এইমাত্র ওটার পজিশন আমাদের ম্যাপে বদলাতে হয়েছে, এক ঘণ্টাও হয়নি। যাচ্ছিল দক্ষিণ দিকে, কোর্স বদলে আবার উত্তরে রওনা হয়েছে। নার্ভার একটা হেলিকপ্টার দেখতে পেয়েছে ওটাকে।'

'ধন্যবাদ, কমরেড,' বলে গট গট করে অফিসে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসল কর্নেল। বিস্ফোরণোন্মুখ মেজাজ সম্পূর্ণ বদলে গেছে, জুনায়েভকে নাটকীয় নির্দেশগুলো দেয়ার সময় শান্ত এবং সুস্থির দেখাল তাকে। 'গোটা আর্কটিক জোনে জরুরী অবস্থা জারি করে দাও। প্রত্যেকটা কোস্টাল বেস, প্রত্যেকটা এয়ারফিল্ড, প্রত্যেকটা আইস আইল্যান্ড, এমনকি আলাস্কা উপকূলের কাছাকাছি দ্বীপগুলোও জরুরী অবস্থার আওতায় থাকবে। মারমানস্কে রেডিও মেসেজ পাঠাও, রাত-দিন চব্বিশ

ঘণ্টার জন্যে আমার জন্যে একটা বাইসন বম্বার রেডি রাখতে হবে, ভরা ট্যাংক নিয়ে। লেনিনগ্রাদ এয়ারপোর্টকে বলে রাখো, মারমানস্কে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে এক ঘণ্টার নোটিশে একটা প্লেন চাই।’

‘তার আগে আমি কি, কর্নেল কমরেড, মস্কোর সাথে যোগাযোগ করব…’

‘খুস্কায়েভ আর তার স্পেশাল ডিটাচমেন্টকে মারমানস্ক পাঠিয়ে দাও–ওদের প্লেন যেন আধ ঘণ্টার মধ্যে টেক-অফ করে…’

‘কর্নেল কমরেড, মস্কোর অনুমতি…’

‘ডিটাচমেন্টের সবাই সাদা পোশাক পরে যাবে, পারসোনাল আর্মস থাকবে সাথে। আই.আই. ফাইভ এরিয়ার আবহাওয়া রিপোর্ট এনে দাও…’

‘মস্কোকে কিছুই জানাব না, কর্নেল কমরেড? এই স্কেলের একটা অপারেশন জেনারেল মিঝিরিভস্কির অনুমতি ছাড়া…!’

একমনে পাইপে টোবাকো ভরছে কর্নেল বলটুয়েভ। ‘তোমাকে আমি বারবার বলেছি, জুনায়েভ, মাথাটা কামিয়ে ফেলো। তবে যদি ঘটে কিছু বুদ্ধি…’

‘কিন্তু কর্নেল কমরেড, কাঁকড়ার মেসেজে পরিষ্কার কিছু নেই!’

‘কাঁকড়াকে চিনলে তুমি বুঝতে পারতে, আছে। আমেরিকানরা তাদের আই. আই. ফাইভের কাছে পিঠে বড় ধরনের কোন অপারেশন করতে যাচ্ছে। রাশিয়ার চরম শত্রু মাসুদ রানার সাহায্য নিচ্ছে ওরা। এর বেশি আর কিছু জানার দরকার আছে কি? মাসুদ রানা মানেই তো বিপদের মিছিল। কে.জি.বি-কে সে

ধোঁকা দিতে পারে, ধোঁকা দিয়ে ক্ষমাও পেতে পারে, কিন্তু স্পেশাল সিকিউরিটিকে ধোঁকা দেয়া সহজ নয়, আর কর্নেল বলটুয়েভ শত্রুকে ক্ষমা করতে জানে না।' হঠাৎ চোখ পাকাল সে। 'কি, এখনও তুমি দাঁড়িয়ে যে?'

দরজার কাছে গিয়ে ফিরল জুনায়েভ। 'এখনও আপনি চান, কর্নেল কমরেড, ইউরি রুস্তভকে তালিন থেকে এখানে নিয়ে আসা হোক?'

'অবশ্যই,' পাইপে আগুন ধরাল কর্নেল। 'ওটা আলাদা একটা সমস্যা।'

রানা একাই যেন একশো, যেন একটা প্রতিষ্ঠান। গত ষোলো ঘণ্টায় ওয়াশিংটন থেকে থিউল-এ উড়ে এসেছে ও, কপ্টার নিয়ে জনসনকে ধাওয়া করে হামবোল্ডট গ্লেসিয়ারে গেছে, ওখান থেকে ফিরে প্লেনে করে গ্রীনল্যান্ডের সবটুকু প্রস্থ পেরিয়ে পৌঁচেছে কার্টিস ফিল্ডে। শনিবার, ওয়াশিংটন সময় সন্ধে তখন সাতটা। ন'টার মধ্যেই ওদের যাত্রা শুরুর সমস্ত আয়োজন শেষ হয়ে গেল। এ যেন কোন মানুষ নয়, রানাকে দেখে কার্টিস ফিল্ডের লোকজন উপলব্ধি করল: মূর্তিমান ঘূর্ণি-ঝড়।

প্লেন থেকে নেমেই রানা অর্ডার করল, 'দু'ঘণ্টার মধ্যে একজোড়া সিকোরস্কি তৈরি অবস্থায় চাই আমি। পুরোপুরি সার্ভিস করা, ভরা ট্যাংক...'

'সম্ভব নয়,' ঝাঁঝের সাথে বাধা দিল এয়ারফিল্ডের কন্ট্রোলার হাওয়ার্ড ম্যাকলিন।

'আরও লোক লাগান! নাকি জেনারেল ফচকে ফোন করব?

দায়টা আপনাদের...'

দু'ঘণ্টা পাঁচ মিনিটের মাথায় হেলিকপ্টার দুটো তৈরি হয়ে গেল। আগেই আই.আই. ফাইভের কাছাকাছি এলাকার আবহাওয়া চেক করার জন্যে একটা প্লেন পাঠানো হয়েছিল, ফিরে এসে পাইলট রিপোর্ট করল ওদিকে কোন কুয়াশা নেই। ক্যাম্প সেঞ্চুরি থেকে একজোড়া এস্কিমো-টাইপ স্লেজ আনিয়ে রাখা হয়েছে। খাবারদাবার, রেডিও ট্র্যানসিভার, রাইফেল, অ্যামুনিশন, এবং একটা ইলিয়ট হোমিং বীকন প্যাক করে তোলা হলো।

'বীকন কেন?' জিজ্ঞেস করল ম্যাকলিন।

'ইন্সুরেন্স।'

ঝটপট, ছোট্ট করে উত্তর দেয় রানা, কোন তথ্য প্রকাশ পায় না। অস্থিরভাবে হ্যাঙ্গারের ভেতর ঘুর ঘুর করতে লাগল ও। সিকোরস্কির কন্ট্রোল চেক করল, স্লেজে যে প্যাকেটগুলো তোলা হবে সেগুলো বাঁধার কাজে সাহায্য করল, বারবার রেডিও রূমে গিয়ে জানতে চাইল ওয়াশিংটন থেকে কোন মেসেজ এসেছে কিনা। তার প্রাণশক্তির যেন সীমা নেই, নিমেষের মধ্যে এয়ারফিল্ড কর্মীদের মধ্যে তা সংক্রমিতও হয়ে গেল, চার ঘণ্টার কাজ দু'ঘণ্টায় তুলে দিল তারা। রানার এই তৎপরতা দেখার সুযোগ ঘটলে কর্নেল বলটুয়েভ নিশ্চয়ই ভারী উদ্বেগ বোধ করত।

ওদিকে, রেডিও রূমে, থিউল-এর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টায় গলদঘর্ম হচ্ছে বিনয় মুখার্জি। শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ হলো। 'আমি চাই কুকুরগুলো এখুনি পাঠানো হোক। কি, কোন প্লেন নেই? শুধু একটা হারকিউলিস পয়েন্ট ব্যারো-য় যাবার জন্যে টেক-অফ করতে যাচ্ছে? বেশ, চেয়ার থেকে পাছা তুলে ওটাকে

থামান, কুইক! ওটা যদি টেক-অফ করে, জেনারেল ফচকে দিয়ে মাঝ-আকাশ থেকে ফিরিয়ে আনাব…'

'কুকুরগুলোর এক ঘণ্টা আগে আসার কথা ছিল,' পিছন থেকে ভারী গলায় বলল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বিনয়। তিক্ত হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে। 'এখুনি চাও, নাকি যখন পৌঁছুবে?'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'বোথ—অ্যান্ড সুনার!'

দু'ঘণ্টা পর ওদের জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে বিনয় রিপোর্ট করল, 'কুকুর পৌঁছে গেছে।'

রানা বলল, 'নিয়াজকে বলো চেক করে দেখে নিক…'

রানার কথা শেষ হবার আগেই ঘরে ঢুকল নিয়াজ মাহমুদ।

'যাও, কুকুরগুলো চেক করো,' তাকে বলল বিনয়। 'পতাকার মত ওটা কি নাড়ছ শুনি?'

একগাল হাসল সুদর্শন নিয়াজ। 'জেনারেল ফচের আর্জেন্ট মেসেজ। এক্ষুণি রওনা হবার জন্যে রেডি হতে বলা হয়েছে।'

এর কোন নজির নেই, তাই আবহাওয়াবিদরা একেবারে হতচকিত হয়ে পড়ল। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে গ্রীনল্যান্ডে নিম্নচাপ অসম্ভব একটা ব্যাপার।

এই নিম্নচাপই সে বছরের পরের মাসগুলোয় উত্তর আমেরিকা আর পশ্চিম ইউরোপে বিপর্যয় ডেকে আনে, গ্রীষ্মকাল হয়ে ওঠে ভয়াবহ শীতকাল, আইসবার্গগুলো ভাসতে ভাসতে দূর দক্ষিণে চলে যায় আগে যেখানে কখনও যায়নি, ফলে ট্রান্স-আটলান্টিক জাহাজগুলোর জলপথ বন্ধ হয়ে যায়, বিশাল লাইনারগুলো বাধ্য

হয় কোর্স বদলাতে। আর, এই নিম্নচাপই ডেকে আনে ভীতিকর কুয়াশা।

নোভাইয়া জেমলাইয়ার সোভিয়েত আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা টের পায়নি কুয়াশা আসছে। পৃথিবীর ছাদের ওপর দিয়ে প্রতিদিন উড়ে যায় ইউ.এস. ওয়েদার প্লেন, তাদেরও চোখ এড়িয়ে গেছে। কিন্তু রানা যখন কার্টিস ফিল্ডের হ্যাঙ্গারে অস্থিরভাবে ঘোরাফেরা করছে, ঠিক সেই সময় আই.আই. ফাইভের উত্তরে নেমে আসছে আধ মাইল উঁচু, বহু মাইল চওড়া ঘন কালো কুয়াশার হিমশীতল আবরণ।

ঘরের মাঝখানে গোল স্পট লাইট, আলোর মধ্যে একটা চেয়ারে বসে আছে ইউরি রুস্তভ। তার পিছনে অন্ধকার, খুক করে কেশে কেউ একজন জানান দিল সে আছে। ইউরির সামনেও অন্ধকার, অন্ধকার থেকে মাঝে মধ্যে ভেসে আসছে চেয়ারের কঁ্যাচ কঁ্যাচ আওয়াজ। কর্নেল বলটুয়েভ নড়াচড়া করছে চেয়ারে বসে।

তালিন থেকে প্লেনে করে নিয়ে আসার সময় ইউরি রুস্তভকে কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। অজানা আশঙ্কায় এমনিতেই কুঁকড়ে ছিল বেচারা, তারপর এই ঘরের পরিবেশ তাকে একেবারে দিশেহারা করে তুলেছে।

কর্নেল বলটুয়েভ জানে না, চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ইউরিকে মচকাতে হবে তার। আর চল্লিশ মিনিট পর লেনিনগ্রাদে চারটে বাজবে, এন.পি. সেভেনটিনে বাজবে রাত বারোটা। ঠিক চল্লিশ মিনিট পর পোলার প্যাক ধরে অদৃশ্য হয়ে যাবে ইভেনকো রুস্তভ।

'ঘটনাটা আবার শোনা যাক,' মোলায়েম কণ্ঠে বলল কর্নেল,

তাতেই ইউরির কানের পাশে যেন বোমা ফাটল। 'তুমি পার্কে ঢুকলে, এখান থেকে শুরু করো।'

ইউরির মাথা ঘুরছে। পনেরো বার, নাকি পঁচিশ বার? ঘটনাটা কত বার বর্ণনা করেছে এখন আর মনে করতে পারে না সে। 'পার্কে ঢুকলাম...'

বাধা। 'কেন?'

'আমি ডকে যাচ্ছিলাম...'

'তাহলে নিশ্চয়ই নেভ্স্কি প্রসপেক্ট ধরে যাও তুমি, ওটাই সহজ রাস্তা।'

'হ্যাঁ, নেভ্স্কি প্রসপেক্ট ধরে যাচ্ছিলাম...,' একঘেয়ে কণ্ঠস্বর ইউরির, যেন কোন বাচ্চা পড়া মুখস্থ করছে।

'না, তা তুমি যাওনি–গেলে পার্কে ঢুকতে না। কেন, পার্কে ঢুকলে কেন?'

বিদেশী লোকটা পার্কের রাস্তায় আছাড় খেলো, ঘটনার এই পর্যায়ে এল ওরা। এবার নিয়ে ছাব্বিশ বার একই প্রশ্ন করল কর্নেল, 'আমরা তার শুধু নামটা জানতে চাই। এরমধ্যে আর কিছু নেই, কমরেড। শুধু নামটা।'

'আমেরিকান একজন লোকের নাম আমি জানব কিভাবে...' হঠাৎ চুপ করল ইউরি। ভুল যা হবার হয়ে গেছে।

ঘেমে গোসল হবার জন্যে ইউরিকে পুরো এক মিনিট সময় দিল কর্নেল। ওরা কেউ ইউরিকে বলেনি ডকিনস একজন আমেরিকান ছিল। ডকিনসের কাপড়চোপড় ছিল রাশিয়ানদের মত। তাছাড়া, ইউরি বারবার বলছে, বিদেশী লোকটার সাথে তার কোন কথা হয়নি। 'নিচে নিয়ে যাও ওকে,' নিজের লোকদের

নির্দেশ দিল কর্নেল। ঘর খালি হয়ে যেতে সহকারী জুনায়েভকে আদেশ করল সে, 'যা জানে সব বের করো, জলদি।'

একজন নাবিকের কাছে ডুবে মরাটা সবচেয়ে বেশি আতঙ্ককর। তাই ওরা তার ওপর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ব্যবহার করল।

বেসমেন্ট সেলারে একটা কাউচে বসিয়ে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা হলো ইউরি রুস্তভকে, কাউচটা ইচ্ছেমত সামনে পিছনে হেলানো যায়। অন্ধকার কোথাও ভরা একটা বালতিতে চামচ বা খুন্তি নেড়ে পানির আওয়াজ তোলা হচ্ছে।

'আমেরিকান লোকটা কি মেসেজ দিল তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল নিকিতা জুনায়েভ।

'কোন মেসেজ দেয়নি...'

একজন লোক ইউরির চোয়াল দু'হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল, দ্বিতীয় আরেকজন তার মুখের ভেতর পুরে দিল রাবারের চোঙ, তৃতীয় লোকটা চোঙের ভেতর পানি ঢালছে। বিষম খাওয়ার অনুভূতি হলো ইউরির, বন্ধ হয়ে এল দম, ডুবে যাবার অনুভূতিটা আরও পরে হবে। ইউরির পাশে একটা টুলে বসে রয়েছে একজন ডাক্তার, ইউরির নগ্ন বুকে চেপে ধরে আছে স্টেথসকোপ।

ইউরির চোখ কাপড়ের পট্টি দিয়ে বাঁধা। হাত-পা ছুঁড়তে চেষ্টা করছে, কিন্তু এক চুল নাড়তে পারছে না। গলা দিয়ে নামছে পানি, পেট ভরে গেল, ফুসফুস ডুবে গেল। তার মনে হতে লাগল সে ডুবে যাচ্ছে। মনে হলো, তার সারা শরীর ফুলে উঠেছে। এভাবে আরও তিন মিনিট কাটল। এক সময় ঝট্ করে জুনায়েভের দিকে ফিরল ডাক্তার।

মাথা ঝাঁকাল জুনায়েভ। কাউচ খাড়া করা হলো, বসার ভঙ্গিতে ফিরিয়ে আনা হলো ইউরিকে। বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগল সে। হ্যাঁচকা টানে তার চোখের পট্টি খুলে নিল জুনায়েভ।

'বলো, কি কথা হলো তার সাথে?'

দু'চোখ ভরা নগ্ন ঘৃণা নিয়ে জুনায়েভের দিকে তাকিয়ে থাকল ইউরি। তারপর চট করে হাতঘড়ির দিকে একবার তাকাল সে। লক্ষ করে হাতঘড়িটা কব্জি থেকে খুলে নিল জুনায়েভ।

ঘড়ি হারিয়ে মাথা খারাপের মত অবস্থা হলো ইউরির। তার ওপর যত নির্যাতনই চালানো হোক, ভাই ইভেনকোকে পালাবার একটা সুযোগ দিতে চায় সে। জানে, শেষ পর্যন্ত মুখ তাকে খুলতেই হবে। কিন্তু ইভেনকো এন.পি. সেভেনটিন থেকে রওনা হয়ে যাবার পর, তার আগে নয়। ঘড়ি না থাকায় এখন সে বুঝবে কিভাবে ইভেনকো রওনা হয়ে গেছে কিনা...?

আবার শুরু হলো ওয়াটার ট্রিটমেন্ট। এক সময় ইউরির মনে হলো, সে মারা যাচ্ছে। মনে হলো, একটানা বিশ মিনিট পানি খাওয়ানো হচ্ছে তাকে। প্রাণে বাঁচতে হলে, অন্তত দিন কয়েক বেঁচে থাকতে হলে, সব কথা স্বীকার করা দরকার এবার।

আসলে বিশ মিনিট নয়, নতুন করে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট শুরু হবার পর মাত্র পাঁচ মিনিট পেরিয়েছে।

বাইশ ঘণ্টা বিছানার ধারেকাছে যায়নি কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ, অথচ লোকজনকে তাড়া করার বহর দেখে মনে হলো এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে সে। জুনায়েভের কাছ থেকে খবর পেয়ে নয়, একটা

মেসেজ পেয়ে ঝড় তুলল সে।

ঘরে ঢুকে জুনায়েভ বলল, ‘কর্নেল কমরেড, ইভেনকো রুস্তভ আমেরিকায় পালাচ্ছে…’

‘কথাটা আদায় করতে দু’ঘণ্টা নিলে তুমি, জুনায়েভ,’ প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে বলল কর্নেল, চট করে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সাড়ে পাঁচটা বাজে। ‘অনেক দেরি করে ফেলেছ। এই মেসেজটা দেখো, এন.পি. সেভেনটিন থেকে এসেছে।’

কর্নেলের অফিসে স্টোভ জ্বলছে, এরই মধ্যে ঘামতে শুরু করেছে জুনায়েভ। কাগজটা নিয়ে পড়তে শুরু করল সে, ‘ইভেনকো রুস্তভ ডগ টীম নিয়ে এন.পি. সেভেনটিন ত্যাগ করেছে। সিকিউরিটি এজেন্ট আন্তভের লাশ পাওয়া গেছে বরফে। সার্চ পার্টি পাঠানো হয়েছে। নির্দেশ পাঠান। ড. নিকোলাই সোরভ।’

নিজের হাতে মেসেজের উত্তর লিখল কর্নেল, ‘ইভেনকো যত দূর যেতে পারে তারচেয়ে আরও পশ্চিমে যে-ক’টা হেলিকপ্টার পাওয়া যায় পাঠাও। তারপর ওগুলো এন.পি.সেভেনটিনের দিকে ফিরে আসতে শুরু করবে। আই.আই. ফাইভের কাছে পিঠে কোন রকম তৎপরতা দেখামাত্র রিপোর্ট করবে। বলটুয়েভ।’ মেসেজটা নিয়ে রেডিও রূমের দিকে ছুটল বদোনভ।

একগাদা নির্দেশ পেল জুনায়েভ। মারমানস্কের সাথে যোগাযোগ করে জানতে হবে বাইসন বম্বার এই মুহূর্তে টেক-অফ করার জন্যে তৈরি আছে কিনা। জানতে হবে লেনিনগ্রাদ এয়ারপোর্টে প্লেন রেডি করে রাখা হয়েছে কিনা। এম.সিক্সটি-নাইন আর রিগাকে সিগন্যাল পাঠিয়ে উত্তর চাইতে হবে এলাকায়

আমেরিকানদের কোন তৎপরতা আছে কিনা। হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার নার্ভাকে জিজ্ঞেস করতে হবে মার্কিন আইসব্রেকার কিউটের বর্তমান পজিশন।

অ্যাডমিরাল মিঝিরিভস্কি স্পেশাল সিকিউরিটি সার্ভিসের ডিরেক্টর, সাড়ে পাঁচটায় তাঁর ঘুম ভাঙার কথা নয়। তবু মস্কোয় তাঁর নাম্বারে টেলিফোন করল কর্নেল।

'আমিই আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম, বলটুয়েভ!' অ্যাডমিরাল প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন। 'মারমানস্ক থেকে এইমাত্র খবর পেলাম আপনি আর্কটিকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই ওরা ভুল বুঝেছে, তাই না?'

'না, অ্যাডমিরাল। ওরা ঠিকই বুঝেছে।'

'আমার অথরিটি ছাড়া?'

'এ শুধু সতর্ক থাকার জন্যে...'

'ফার্স্ট সেক্রেটারি ব্যাপারটা শুনেছেন—ক্রেমলিন থেকে এখুনি ডেকে পাঠানো হয়েছে আমাকে।'

'ভাল।'

'কি বললেন?' গর্জে উঠলেন অ্যাডমিরাল মিঝিরিভস্কি।

'এই সতর্কতার প্রয়োজন আছে,' কঠিন সুরে বলল কর্নেল বলটুয়েভ। তুরুপের তাসটা এবার ছাড়ল সে, 'এন.পি.সেভেনটিন থেকে ইভেনকো রুস্তভ পালিয়েছে, বুঝলেন? ভাববেন না শুধু মগজটা নিয়ে যাচ্ছে। এইমাত্র জানতে পারলাম, গেল হপ্তায় আমি মস্কোয় থাকার সময় ইভেনকো সিকিউরিটি রূমে ঢুকে দু'ঘণ্টা ছিল। আমার ধারণা, মেরিলিন চার্টের ফটো তুলেছে। আমাদের গোটা আন্ডারওয়াটার সিস্টেমের ব্লু-প্রিন্ট সাথে নিয়ে যাচ্ছে সে।'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেলেন অ্যাডমিরাল মিখিরিভস্কি। শান্ত গলায় জানতে চাইলেন ইভেনকোকে ফিরিয়ে আনার জন্যে কর্নেলের কি কি সাহায্য দরকার। কর্নেলের উত্তর শুনে চোখ কপালে উঠল তাঁর।

'ক্যারিয়ার নার্ভা, ট্রলার ফ্লীট এম.সিক্সটি-নাইন, আর রিসার্চশিপ রিগার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব,' বলল কর্নেল। 'পার্সোনাল কন্ট্রোল।'

'কি বলছেন! আপনি জানেন এ-ধরনের কোন দৃষ্টান্ত নেই!'

'এ-ধরনের পরিস্থিতিরও কোন দৃষ্টান্ত নেই,' ঝাঁঝের সাথে বলল কর্নেল। 'ফার্স্ট সেক্রেটারি ইচ্ছে করলে অনুমতি দিতে পারেন, সেজন্যেই আপনি ক্রেমলিনে যাচ্ছেন বলে আমি খুশি।'

'প্রথম সুযোগেই আবার যোগাযোগ করব,' থমথমে গলায় বললেন অ্যাডমিরাল মিখিরিভস্কি। 'ইতিমধ্যে আপনি প্রস্তুতি নিতে থাকুন।'

'আমার প্রস্তুতি নেয়া শেষ,' বলে ঘটাং করে রিসিভার রেখে দিল কর্নেল। ফার্স্ট সেক্রেটারির সাথে বিশেষ খাতির আছে তার, কাজেই চীফকে তেমন গ্রাহ্য করে না সে।

ঘরে ঢুকল জুনায়েভ। খবরের আশায় আগ্রহের সাথে মুখ তুলে তাকাল কর্নেল। বলল, 'তৈরি হও, জুনায়েভ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আর্কটিকে পৌঁছব আমরা।'

নিজের অফিসেই একটা বিছানা পেতে নিয়েছেন জেনারেল ফচ। রোববার রাত একটায় ঘড়ির অ্যালার্ম শুনে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। মাথার আর দোষ কি, চব্বিশ ঘণ্টায় দু'ঘণ্টা ঘুমালে ব্যথা তো

করবেই।

দশ মিনিট পর দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকল টমাস। ‘হেলসিঙ্কি থেকে এখনও কোন খবর নেই,’ বলল সে। চেহারা থমথম করছে। ‘প্লেন লেট হতে পারে—এখনও আমি আশা করছি ডকিনস বেরিয়ে আসতে পারে।’

‘তারমানে আমরা অপেক্ষা করব?’

‘হ্যাঁ।’

‘সেটা ভুলও হতে পারে,’ মাথা চুলকালেন জেনারেল। ‘অথচ করারও আমাদের তেমন কিছু নেই। কে জানে, ইভেনকো হয়তো এরইমধ্যে বরফ পাড়ি দিতে শুরু করেছে। আচ্ছা, আই.আই.ফাইভে তো আমরা একটা প্লেন পাঠাতে পারি, পারি না?’

‘কিন্তু...’

সহকারীকে থামিয়ে দিয়ে জেনারেল বললেন, ‘জানি। ইভেনকো রওনা না হয়ে থাকলে আই.আই.ফাইভে প্লেন দেখে রাশিয়ানরা সতর্ক হয়ে উঠবে।’

যে লোক মারা গেছে তার কাছ থেকে মেসেজ পাবার অপেক্ষায় ছটফট করছে ওরা। ওদিকে কর্নেল বলটুয়েভ দূর-দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া শেষ করেছে। গোটা পরিস্থিতিটা যেন অনেকটা এরকম: খেলা শুরু হবার আগেই জিততে শুরু করেছে সে।

রোববার দুপুরে কর্নেল বলটুয়েভের অফিসে পায়ের ধুলো দিলেন সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি। সাথে অ্যাডমিরাল

মিঝিরিভস্কি।

ফার কোট খোলার পর দেখা গেল গাঢ় রঙের বিজনেস সুট পরে আছেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। কোন রকম ভণিতা না করে সরাসরি আলোচনা শুরু করলেন তিনি। 'বলটুয়েভ, ট্রলার ফ্লীটের ছ'টা জাহাজ, হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার নার্ভা, আর রিসার্চ শিপ রিগার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব তোমার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ওগুলোর তৎপরতা দেখে কোনমতেই যেন মনে না হয় মিলিটারি অপারেশন শুরু করেছি আমরা। কি বলতে চাইছি, বুঝতে পারছ?'

'অবশ্যই কোন ইন্টারন্যাশনাল ইনসিডেন্ট ঘটা চলবে না।'

'ঠিক তাই, কোন ইন্টারন্যাশনাল ইনসিডেন্ট নয়,' ভারী গলায় বললেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। 'মে মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মস্কোয় আসার কথা, আমি চাই তিনি আসুন—কাজেই খুব সাবধান।'

'কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকসিডেন্ট ঘটতেই পারে,' ফিসফিস করে বলল কর্নেল বলটুয়েভ। 'এলাকাটা আমি চিনি, সব কিছুই ঘটতে পারে ওখানে। খোলা ফাটলে পড়ে যেতে পারে মানুষ, তুষার ঝড়ে পথ হারাতে পারে...'

ট্রাফিক পুলিসের মত হাত তুললেন ফার্স্ট সেক্রেটারি। 'সব খুলে বলার দরকার নেই, প্লীজ। আমি জানি, ইনসিডেন্ট আর অ্যাকসিডেন্টের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কিভাবে কি করবে, তুমি জানো—ওটা তোমার জগৎ।' তাঁর ঘন ভুরু কুঁচকে উঠল। 'কিন্তু আমার কাছে তুমি শুধু একটা ব্যাপারে দায়ী থাকবে—ইভেনকো। সে বা মেরিলিন চার্ট যেন ওয়াশিংটনে না পৌঁছায়। গোটা ব্যাপারটার গুরুত্ব কতখানি তোমাকে বোঝাবার

জন্যেই লেনিনগ্রাদে আমার আসা।'

'আমেরিকানদের চেয়ে তিন চাল এগিয়ে আছি আমরা,' জবাবে বলল কর্নেল।

'এগিয়ে থাকতেও হবে,' বললেন ফার্স্ট সেক্রেটারি, অ্যাডমিরাল মিঝিরিভস্কির দিকে তাকালেন তিনি। অ্যাডমিরালের হাতে একটা লেদার ফোল্ডার দেখা গেল। 'জাহাজগুলোর সাথে যোগাযোগ করার জন্যে কোড আর ওয়েভলেংথ রয়েছে অ্যাডমিরালের কাছে। এরইমধ্যে ওগুলোকে সংশ্লিষ্ট এলাকার দিকে রওনা হতে বলা হয়েছে।'

'আমিও এখুনি রওনা হতে চাই,' অ্যাডমিরালের হাত থেকে ফোল্ডারটা নিয়ে বলল কর্নেল। 'তা না হলে দেরি হয়ে যাবে...'

ফার্স্ট সেক্রেটারি কর্নেলের একটা হাত চেপে ধরলেন, বললেন, 'পয়মাল, অর্ডার নয়, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, ইভেনকোকে ফিরিয়ে আনো—ভরাডুবি থেকে বাঁচাও রাশিয়াকে।'

রোববার, বিশে ফেব্রুয়ারি, বিকেল তিনটেয় মারমানস্ক থেকে বাইসন বম্বারে চড়ে রওনা হয়ে গেল কর্নেল বলটুয়েভ। সাথে সহকারী নিকিতা জুনায়েভ ছাড়াও ফার-কোট পরা পঞ্চাশজন লোক থাকল। ওরা খালি ডেকে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে, প্রত্যেকের সাথে একটা করে রাইফেল। বম্বারে চড়েই একটা ম্যাপ খুলে বসল কর্নেল, আমেরিকান আইসব্রেকার কিউটের অবস্থান চিহ্নিত করা আছে তাতে।

বিকেলের আকাশে মেঘ নেই, চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে প্রকৃতি। ছুটে চলল বম্বার। গন্তব্য: এন.পি.সেভেনটিন।

‘হেলসিঙ্কি থেকে এখনও কোন খবর নেই।’ পাশের সীটে বসে জেনারেল ফচের হাতে একটা মেসেজ ধরিয়ে দিল টমাস। ‘এইমাত্র এল। আমার মনে হচ্ছে ডকিনসের কিছু একটা ঘটেছে...’

‘সে তো আমি ঘণ্টা কয়েক আগেই সন্দেহ করেছি।’ কাগজটার দিকে জেনারেল তাকালেন কি তাকালেন না, বললেন, ‘ডকিনস বা তার মেসেজ কোন দিনই আর পৌঁছুবে না—বাজি ধরবে?’

পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যায়, কর্নেল বলটুয়েভই সতর্ক করে দিয়েছে জেনারেল ফচকে। গত চার ঘণ্টা ধরে জাহাজ, ওয়েদার প্লেন, আর উপগ্রহ থেকে একের পর এক রিপোর্ট আসছে, প্রতিটি রিপোর্ট থেকে আভাস পাওয়া যাচ্ছে আর্কটিক এলাকায় বিরাট কিছু একটা করতে যাচ্ছে রাশিয়ানরা।

প্রথমে জেনারেল শুনলেন, সোভিয়েত হেলিকপ্টার ক্যারিয়ার নার্ভা কোর্স বদলেছে, এখন সেটা ফুল স্পীডে ছুটছে উত্তরে, আইসফিল্ডের দিকে। এক ঘণ্টা পর খবর এল ট্রলার ফ্লীট এম.সিক্সটি-নাইন-এর ছয়টা জাহাজ, গাদা গাদা ইলেকট্রনিক গিয়ার নিয়ে কোর্স বদলে উত্তর দিকে যাচ্ছে, অথচ আগে পাওয়া খবর অনুসারে ন্যাটোর ওয়াটার কিং-এর ওপর নজর রাখার কথা ওটার। শেষ খবরটা আরও চাঞ্চল্যকর—বিশাল সোভিয়েত রিসার্চ শিপ রিগাও কোর্স বদলেছে। টমাস তাঁকে জানাল, ‘রিগা আইসবার্গ অ্যালি-র দিকে যাচ্ছে।’

এরপর আর চুপ করে থাকা যায় না, জরুরী একটা ফোন

করলেন তিনি। ত্রিশ মিনিট পর চশমা পরা সুবেশী এক লোক ঢুকল তাঁর অফিসে। প্রেসিডেন্টের সহকারী, একান্ত বিশ্বস্তদের একজন, বাধা না দিয়ে ঝাড়া পনেরো মিনিট জেনারেলের কথা চুপচাপ শুনে গেল। সবশেষে জেনারেল বললেন, 'কলিন, এই হলো পরিস্থিতি। মস্কোয় শীর্ষ বৈঠকে বসার সময় প্রেসিডেন্টের পকেটে যদি মেরিলিন চার্ট থাকে, সব দিক থেকে ফলাফল আমাদের অনুকূলে থাকবে। সঙ্গত যে-টুকু কনসেশন আমরা চাইব, রাশিয়া অন্তত গোয়ার্তুমি করে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না...'

প্রেসিডেন্টের সাথে তিন মিনিট কথা বলল সহকারী। রিসিভার রেখে দিয়ে জেনারেলকে বলল সে, 'আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন। সময় না থাকলে ওয়াশিংটন কি সিদ্ধান্ত দেয় তার জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই। শুধু একটা ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, কোন রকম ইন্টারন্যাশনাল ইনসিডেন্ট যেন না ঘটে। তাহলে শীর্ষ বৈঠক বানচাল হয়ে যেতে পারে।'

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন জেনারেল, পাশের সীট থেকে টমাস তাকিয়ে আছে লক্ষ করে হাতের মেসেজটার কথা মনে পড়ল তাঁর।

খুক করে কেশে টমাস বলল, 'হঠাৎ করে কোত্থেকে ঘন কুয়াশা এসে ঢেকে ফেলেছে আই.আই.ফাইভকে।' গম্ভীর দেখাল তাকে। 'রানার জন্যে খুব কঠিন হয়ে গেল কাজটা।'

রিপোর্টটা পড়া শেষ করে সীট-স্ট্র্যাপ বাঁধলেন জেনারেল ফচ। বোয়িং নামছে। গন্তব্য ছিল কার্টিস ফিল্ড। পৌঁছে গেছে বিমান।

ছয়

বরফ-দ্বীপ এন.পি. সেভেনটিন। সরু এক ফালি এয়ারস্ট্রিপ ছুটে এল বাইসনের দিকে। দু'সারি ঝাপসা আলোর মাঝখানে বম্বারের নাক তাক করল পাইলট, থ্রটল পিছিয়ে এনে ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিল নিজেকে। ফালিটা বাইসনের জন্যে খুব ছোট।

বরফ উড়ে এল তার দিকে, নিচ দিয়ে তীরবেগে পিছিয়ে গেল, ঘষা খেলো চাকা। বম্বার ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে, দাঁতে দাঁত চেপে ব্রেক কষল পাইলট। বিস্ফোরিত হলো তুষার মেঘ, সাদা কুয়াশার মত ছলকে উঠে ঢেকে দিল জানালাগুলো। টুকরো বরফ কামানের গোলার মত আঘাত করল আন্ডারক্যারিজে, আওয়াজ শুনে মনে হলো কয়েক হাজার মেশিনগান থেকে গুলি ছুটছে। প্লেন থামল না, এয়ারস্ট্রিপ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে...

পটকা ফাটার মত চটাস করে একটা আওয়াজ হলো প্লেনের ভেতর। কিছু না, উরুর ওপর একটা চাপড় মারল কর্নেল বলটুয়েভ। উরুটা আর কারও হলে ইঞ্চিখানেক ফুলে উঠত সন্দেহ নেই। 'ভারি একসাইটিং, তাই না, জুনায়েভ?' তার চোখ জোড়া পুলকে চকচক করছে।

তার পাশের সীটে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে জুনায়েভ। দস্তানা পরা হাত দিয়ে সীটের হাতল চেপে ধরে আছে সে, চোখ বন্ধ। আপন মনে হাসল কর্নেল। কে বলবে এই জুনায়েভই সন্ত্রস্ত লোকদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে তথ্য আদায়ে ওস্তাদ?

এয়ারস্ট্রিপের ঠিক কিনারায় পৌঁছে থামল বম্বার, একটুর

জন্যে দুর্ঘটনা ঘটল না। প্লেন থামতেই সীট-স্ট্র্যাপ খুলে দরজার কাছে পৌঁছে গেল কর্নেল, তার পিছনের ডেকে গাদাগাদি করে শুয়ে থাকা লোকগুলো নড়ে ওঠার আগেই। গ্রাউন্ড স্টাফরা লোহার সিঁড়ি খাড়া করার আগেই দরজা খুলে ফেলল সে।

সিঁড়িতে পা দিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলল কর্নেল। 'চলে গেছে ওটা? ধুস শালা!'

তরতর করে ধাপ বেয়ে নামল সে, সামনের দিকে কাত হয়ে থাকা পাহাড়ের মত দাঁড়াল বেস লীডার ড. নিকোলাই সোরভের সামনে। জুনায়েভের মতই ড. সোরভ মোটাসোটা, তেমন লম্বা নয়। তার চোখের স্নো-গগলসে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। ব্যাপারটা লক্ষ করার সাথে সাথে মেজাজ খিঁচড়ে গেল কর্নেলের।

'কি চলে গেছে, কর্নেল কমরেড?'

'কি আশ্চর্য! আমি দেখলাম, তুমি কেন দেখোনি? আমরা ল্যান্ড করার সময় একটা প্লেন ছিল আকাশে...'

'দেখেছি, কর্নেল কমরেড। পশ্চিম দিকে উড়ে গেছে ওটা...'

'রাডার, রাডার চেক করেছ?'

'না, কর্নেল কমরেড। এক মিনিট। এক্ষুণি আসছি...'

'তুমি জানো, জুনায়েভ, অযোগ্য লোকদের নিয়ে কি অসুবিধে?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল, জুনায়েভ এই মাত্র সিঁড়ি বেয়ে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'জ্বী,' মিনমিন করে শুরু করল জুনায়েভ, '...'

'ধমক দেয়া যায় না, প্যান্ট খারাপ করে ফেলবে। সোরভ পোলার বেয়ারের চেয়ে ভয়ঙ্কর–সব ইডিয়টই তাই।' পারকার ভেতর হাত ঢুকিয়ে নিজের চারদিকে তাকাল কর্নেল। ঘাঁটির

নির্জনতা তার মনে একটা ছাপ ফেলল। সবগুলো দিকেই সিকি মাইল পর্যন্ত মোটামুটি সমতলই বলা যায়, তারপরই শুরু হয়েছে জ্যান্ত, ভয়ঙ্কর পোলার প্যাক–বিশাল বরফ খণ্ডের নারকীয় স্তূপ, মনে হলো যেন লাফ দিয়ে উঠে এসে গোটা দ্বীপটাকে গ্রাস করার জন্যে ছটফট করছে।

'দ্বীপের আয়ু শেষ,' গলায় ঘড়ঘড়ে আওয়াজ তুলে মন্তব্য করল সে।

আমেরিকান রিসার্চ বেসে ক্যাম্প এরিয়া থেকে এয়ারস্ট্রিপ যথেষ্ট দূরে থাকে, এখানে তা নয়। এন.পি. সেভেনটিনের সমতল ছাদঅলা ঘরগুলো থেকে মাত্র ত্রিশ মিটার দূরে রানওয়ে। ছোট্ট কলোনির মাথার ওপর একশো ফিট উঁচু হয়ে আছে রাডার মাস্ট, রাডারের ডানা আকৃতির কান অনবরত ঘুরছে। জুনায়েভকে এক পশলা নির্দেশ দিল কর্নেল, ড. সোরভ এক ছুটে ফিরে আসতে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'রাডারে এখন ওটা পিনের মাথা, দেখা যায় কি যায় না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সোরভ। 'আমেরিকান পাইলট আপনাদের দেখেই লেজ তুলে গ্রীনল্যান্ডের দিকে ফিরে গেছে আবার।' গর্বের সাথে হাসল সে, যেন একটা যুদ্ধ জয় করেছে। কর্নেল বলটুয়েভ হাত লম্বা করে তার গগলসটা কপালের ওপর তুলে দিল।

'দিন নয়, ঝড় নয়, এটা পরে সং সেজে আছ কেন?' বেস লীডারের দিকে ঝুঁকে পড়ল কর্নেল। 'হেলিকপ্টারগুলো ইভেনকোর খোঁজ পেয়েছে? তাকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছ? স্নোক্যাটস পাঠিয়েছ? এমন কিছু করেছ যাতে ভাল কিছু আশা করা যায়?'

'ইভেনকোকে এখনও পাওয়া যায়নি...,' নার্ভাস হয়ে পড়ল

সোরভ, ঘন ঘন নিচের ঠোঁট মুখের ভেতর পুরে চুষছে। 'এখনও সার্চ করছে ওরা...'

'নামো তোমরা!' হুঙ্কার ছাড়ল কর্নেল, লম্বা লম্বা পা ফেলে এয়ারস্ট্রিপের ওপর দিয়ে ক্যাম্পের দিকে এগোল। বাইসন থেকে কারা নামছে দেখার জন্যে মার্কিন প্লেনটা কাছেপিঠে নেই, কাজেই পিছন ফিরে তাকাবার গরজও অনুভব করল না।

বাইসনের ল্যান্ড করতে সুবিধে হবে ভেবে ছয়টা হেলিকপ্টারকে এয়ারস্ট্রিপের সামনে সরিয়ে রাখা হয়েছে। 'ওগুলো এখানে কেন, আকাশে নয় কেন?'

কর্নেলের পাশে থাকার জন্যে রীতিমত ছুটতে হচ্ছে ড. সোরভকে। 'ওগুলো এইমাত্র নার্ভা থেকে এসে পৌঁচেছে, কর্নেল কমরেড...'

'ডিমে তা দিতে? অ্যাঁ? আবহাওয়ার শেষ খবর কি?'

'আই.আই. ফাইভের ওপর কুয়াশা থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই কুয়াশার জন্যেই সার্চ করা কঠিন...'

'ছিটেফোঁটা ঘিলু যদি বা মাথায় থাকে, সব খেয়ে ফেলছে তোমার ওই চুল–প্রথম সুযোগেই কামিয়ে ন্যাড়া হয়ে যাবে। এটা আমার আদেশ। বুদ্ধু কাঁহিকে, কুয়াশা থাকলে আমেরিকানরা ইভেনকোকে প্লেনে তুলে নিয়ে যেতে পারবে না।' ঘরগুলোর কাছাকাছি চলে এল ওরা, ছাদ থেকে বরফের ঝুরি আর থাম নেমে এসেছে, গ্রীষ্মকালের আগে গলবে না ওগুলো। 'কুয়াশা সরে গেলেই বরফ থেকে ওকে তুলে গ্রীনল্যান্ডে নিয়ে যাবে ওরা।' অন্যমনস্ক দেখাল, যা ভাবছে বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে, 'আই.আই.ফাইভের পশ্চিমে আমাদের লোক পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়ে

থাকবে। ওদের মাথার ওপর ছাতার মত ঝুলে থাকবে হেলিকপ্টারগুলো। ইভেনকোকে নিতে আসছে মাসুদ রানা,কেউ যদি তাকে জ্যান্ত ধরে এনে আমার হাতে তুলে দিতে পারে, বিদেশে চাকরির সুযোগ সহ তিনটে প্রমোশন। লাশ এনে দিতে পারলে শুধু প্রমোশন–তিনটে।'

'কর্নেল কমরেড,' ভয়ে ভয়ে, ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল ড. সোরভ, 'সেটা কি বিপজ্জনক হয়ে যাবে না? আমেরিকানরা ব্যাপারটাকে...'

'কেউ জানবে কেন?' চোখ পাকাল কর্নেল। 'দুর্ঘটনার মত করে সাজাতে হবে।'

'আর ইভেনকোর ব্যাপারে, কর্নেল কমরেড?'

'ইভেনকো রুস্তভ একটা উন্মাদ,' ঘোষণার সুরে বলল কর্নেল। 'একজন খুনী। আমাদের একজন বিজ্ঞানী, ওশেনোগ্রাফার পিটার আন্তভকে খুন করেছে সে।'

'জ্বী, কর্নেল কমরেড?' চোখ কপালে তুলল ড. সোরভ। 'এ আপনি কি বলছেন! আন্তভ তো সিকিউরিটি এজেন্ট...'

'তুমি এত বড় গবেট, বিশ্বাস করা কঠিন!' বরফে পা ঠুকল কর্নেল। 'এইমাত্র আন্তভ একজন ওশেনোগ্রাফার হয়েছে। ইভেনকো একজন ক্রিমিনাল, সে তার একজন সহকর্মীকে খুন করে পালিয়েছে, কাজেই তাকে গ্রেফতার করে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাপারটা ছিল পলিটিক্যাল কেস, এখন হয়ে গেল পুলিস কেস।'

'পুলিস কেস?' চিন্তিত দেখাল ড. সোরভকে। 'পরিস্থিতি তাতে পাল্টে যাবে, বলছেন?'

'যাবে না! পুলিস কেস মানেই হলো এখন আমরা ইভেনকোকে দেখা মাত্র গুলি করতে পারব, তার সাথে যারা থাকবে তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারেও আমাদের কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না। অজুহাত তৈরি হয়ে গেছে—ইভেনকো রুস্তভ একটা বিপজ্জনক ম্যানিয়াক। অর্থাৎ, সোরভ, আমাদের এই অভিযান মানুষ শিকারের অভিযান!'

কার্টিস ফিল্ডে রানার সাথে দেখা করার কয়েক মিনিট পরই আবার প্লেনে চড়লেন জেনারেল স্যামুয়েল ফচ। দুই সীটের একটা সেসনা, তরুণ পাইলট লিয়ন চ্যাপেল সারাক্ষণ চুইংগাম চিবাচ্ছে। গ্রীনল্যান্ডকে পিছনে ফেলে পোলার প্যাকের ওপর চলে এল প্লেন। পুব দিকে যাচ্ছে ওরা।

'বলছি না আই.আই.ফাইভকে খুঁজে বের করো,' পাইলটকে অভয় দিয়ে বললেন জেনারেল। 'আমি শুধু পরিস্থিতিটা নিজের চোখে দেখতে চাই।'

কথা বলার সুযোগ পেয়ে খুশি হলো লিয়ন চ্যাপেল, 'স্লেজ নিয়ে বা হেঁটে, বরফের ওপর দিয়ে বেসে পৌঁছুনো সম্ভব বলে আমি মনে করি না, স্যার। কুয়াশা কেটে গেলে প্লেন নিয়েই যেতে হবে মি. রানাকে—বরাবর আমরা যেভাবে যাই।'

দু'হাজার ফিট ওপর দিয়ে উড়ছে সেসনা। নিচে পোলার প্যাক বহুদূর পর্যন্ত সমতল, শুধু প্রেশার রিজগুলো উঁচু বাঁধের মত ঢেউ তুলে আছে। ওপর থেকে ঝাপসা, চিড় ধরা কাঁচের মত দেখাল বরফের গা। ত্রিশ মিনিট পর সীটের কিনারায় প্রায় ঝুলে থাকতে দেখা গেল জেনারেলকে, ঝুঁকে পড়ে ধূসর রঙের ঘন কুয়াশা

দেখছেন। এরকম কুয়াশা আগে কখনও দেখেননি তিনি, ঢেউ খেলানো নিরেট মেঘ যেন, নিচের বরফ সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়েছে। কুয়াশার ওপরের কিনারায় খুদে ছারপোকা আকৃতির একটা বিন্দু দেখা গেল, ওঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। 'দেখতে পাচ্ছ, চ্যাপেল?'

'হেলিকপ্টার, স্যার। রাশিয়ান।'

'সাবমেরিন কিলার?'

'হ্যাঁ।'

'প্যাকের দক্ষিণে ওদের একটা ক্যারিয়ার আছে, নিশ্চয়ই ওটা থেকে এসেছে। আরও কাছ থেকে দেখতে চাই। ডাইভ!'

খসে পড়ার মত দ্রুত নিচের দিকে নামতে শুরু করল সেসনা। রাশিয়ান হেলিকপ্টার মাত্র আধ মাইল দূরে। যত দ্রুত নামছে সেসনা, কুয়াশা তত দ্রুত উঠে আসছে ওদের দিকে। একটা ঝাঁকি খেয়ে প্লেন সিধে হলো, সীট থেকে ছিটকে পড়ে যাওয়ার কথা জেনারেলের। কিন্তু তৈরি ছিলেন তিনি। হেলিকপ্টার এখন ওঁদের তিনশো ফিট নিচে। তারপরই হারিয়ে গেল ওটা, ঢুকে পড়ল কুয়াশার ভেতর।

'যেন লজ্জাবতী লতা, পালিয়ে বাঁচল!' জেনারেলের বলার ভঙ্গিতে খেদ প্রকাশ পেল। 'এদিকে আগে কখনও দু'একটা চোখে পড়েছে, চ্যাপেল?'

'এত পশ্চিমে—না, অন্তত এই মডেলের নয়। আই.আই. ফাইভকে ছাড়িয়ে আরও দূরে চলে এসেছি, স্যার।' কুয়াশার শেষ প্রান্তের কিনারা দেখতে পেল ওরা, আরও সামনে চাঁদের আলোয় স্ফটিকের মত চকচক করছে পোলার প্যাক। 'এন.পি.সেভেনটিন,

রাশিয়ান বেসের কাছাকাছি চলে এসেছি।’

‘ওরা কি করছে দেখতে চাই। তোমার ভয় করছে?’ একটু যেন কৌতুকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল।

‘তাড়া করবে, স্যার,’ বলল চ্যাপেল। ‘প্রায় এখানেই একবার ওদের একটার সাথে আমারটার আরেকটু হলে ধাক্কা লাগত।’ আপন মনে হাসল সে। ‘প্রতিবেশী হিসেবে তেমন সুবিধের নয়, স্যার। আপনি চাইলে আরও কাছে যেতে পারি। ওই দেখুন, স্যার!’

বরফের ওপর সবুজাভ ফসফরেসেন্সের আভা দেখে বোঝা গেল নিচে এন.পি. সেভেনটিনের ওপর ওটা এয়ারস্ট্রিপ। ঘরগুলো এখনও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অন্য একটা জিনিস ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। চোখের চারপাশ কুঁচকে সামনের দিকে ঝুঁকলেন জেনারেল। ‘ঠিক সময়ে এসেছি! তোমার মেডেল পাওয়া উচিত, চ্যাপেল, মাই বয়।’ দূর থেকে ছোট ছায়ার মত দেখাল জিনিসটাকে, আকাশ থেকে নিচের দিকে নেমে আসছে, পিছনে ছেড়ে আসছে পেন্সিল-সরু বাষ্প। এন.পি. সেভেনটিনে একটা বাইসন বম্বার নামছে।

‘ফিরে যাব, স্যার?’

‘থামো!’

দ্রুত চিন্তা চলছে জেনারেলের মাথায়। বাইসন বম্বার! ভারি ইন্টারেস্টিং তো! রাশিয়ানরা সাধারণত আর্কটিকে বাইসন ব্যবহার করে না, তারমানে মারমানস্ক থেকে জরুরী কিছু বয়ে আনছে। যন্ত্রপাতি, নাকি মানুষ? গ্রাউন্ড লেভেলে নেমে গেল বম্বার, দু’সারি আলোর মাঝখানে। এতক্ষণে ঘরগুলো দেখতে পেলেন জেনারেল।

‘ওদের রাডারে আছি আমরা,’ সাবধান করে দিয়ে বলল চ্যাপেল। ‘এবার ওরা তাড়া করার জন্যে প্লেন পাঠাবে।’

‘নিচে তাকাও, বোকা!’

সাতশো ফিট নিচে তাকিয়ে চ্যাপেল দেখল, এয়ারস্ট্রিপের দু’পাশের আলো নিভে গেছে। তারমানে এই মুহূর্তে কোন প্লেন আকাশে উঠবে না। কাছিম আকৃতির ছয়টা স্নো-ক্যাট দেখল সে, সোভিয়েত বরফ-দ্বীপের পশ্চিমে। সরাসরি আই.আই.ফাইভের দিকে যাচ্ছে ওগুলো। এত উঁচু থেকে মনেই হয় না নড়ছে বলে, কিন্তু পিছনে রেখে যাচ্ছে ক্যাটারপিলার চাকার দাগ।

বাইসন বম্বার আর স্নো-ক্যাট দেখে যা বোঝার বুঝে নিলেন জেনারেল ফচ।

‘ফেরো,’ বললেন তিনি। সাথে সাথে প্লেন ঘোরাতে শুরু করল চ্যাপেল, সেই সাথে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে। ‘কার্টিস ফিল্ডের সাথে যোগাযোগ করো…’

‘ব্যাড স্ট্যাটিক, স্যার…’

‘চেষ্টা করো,’ গর্জে উঠলেন জেনারেল। ‘একটাই মেসেজ–টেকনিকালার। বারবার, হাজারবার–টেকনিকালার!’

এই কোড সিগন্যালের জন্য কার্টিস ফিল্ডে অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে রানা। পেলেই আই. আই. ফাইভের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে ও।

গ্রীনল্যান্ড উপকূল থেকে একশো মাইল দূরে, পোলার প্যাকের ওপর খাড়াভাবে নামতে শুরু করল একজোড়া সিকোরস্কি হেলিকপ্টার, যেন তারের শেষ মাথায় ঝুলছে ওগুলো। বিপজ্জনক

একটা মুহূর্ত—অচেনা বরফে যে-কোন ধরনের ল্যান্ডিং বিপজ্জনক। আকাশ থেকে বোঝার উপায় নেই নিচে ওখানে নিরেট বরফ আছে কিনা। দেখে মনে হতে পারে মুক্ত বরফ, কিন্তু বরফে চাপ পড়লে ফেটে যেতে পারে, বাহনসহ আরোহীরা তলিয়ে যেতে পারে হিম আর্কটিক মহাসাগরে। ওপর থেকে অনেক সময় বরফ সমতল কিনা তাও বোঝা যায় না। সমতল না হলে উল্টে যেতে পারে কপ্টার, ফলে বরফে ধাক্কা খায় প্রথমে ঘুরন্ত রোটর ব্লেড। আরোহীরা হয়তো নামার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল, পরমুহূর্তে দেখা যাবে রোটর ব্লেড তাদেরকে কচুকাটা করছে। অবশ্য যদি না ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়; হলে, পুড়ে মরতে হবে সবাইকে।

উদ্বিগ্ন রানা একটা ঝাঁকির জন্যে অপেক্ষা করছে। ঝাঁকিটাই বলে দেবে শক্ত বরফে নামতে পেরেছে হেলিকপ্টার। পাইলটের পাশে অবজারভারের সীটে বসেছে রানা, আগ্রহের সাথে তাকিয়ে আছে কালেকটিভ স্টিক ধরা পাইলটের হাতের দিকে। স্টিকটা ওদের নিচে নামা নিয়ন্ত্রণ করছে। আশার কথা, পাইলটের হাত একটুও কাঁপছে না। তার মুখের দিকে চট করে একবার তাকাল ও—হেলমেট, গগলস্, আর হেডসেটের আড়ালে যতটুকু দেখা যায়। শক্ত হয়ে আছে চেহারা, সম্ভবত ঝাঁকিটা অনুভব করার জন্যে দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে।

রানার পিছনের সীটে নয়টা কুকুরকে নিয়ে বসেছে বিনয়, কুকুরগুলো নাকি সুরে গোঙাচ্ছে, কপ্টারের এই খাড়াভাবে খসে পড়া পছন্দ করছে না ওগুলো। আর একদল কুকুর ও স্লেজ নিয়ে নিয়াজ মাহমুদ রয়েছে দ্বিতীয় কপ্টারে।

হাতঘড়ি দেখল রানা। পাইলট রিচার্ড ওয়েন জানিয়েছে ত্রিশ

সেকেন্ডের মধ্যে পোলার প্যাকে নামবে ওরা। আর বিশ সেকেন্ড।

খানিক আগে রানা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এখানে নামার ঝুঁকি নিতে তুমি?'

'না!' মুখের ওপর স্পষ্ট জবাব দিতে ইতস্তত করল না ওয়েন। 'কিন্তু আমার ওপর অর্ডার আছে আপনাকে নামাতে হবে, ইফ হিউম্যানলি পসিবল। কাজেই ঝুঁকিটা নিতে হবে, তাই না?'

ঈয়ার-প্যাড অ্যাডজাস্ট করল রানা। সবকিছু কাঁপছে—পায়ের নিচে মেঝে, গম্বুজ আকৃতির সিলিং, পাইলটের সামনে কন্ট্রোল। পাশে বসা একটা কুকুরের মাথায় হাত রাখল রানা, দস্তানা পরা হাতে খুলির কাঁপন পরিষ্কার অনুভব করতে পারল। ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনে চড়ে অভ্যেস আছে ওগুলোর, হেলিকপ্টার দু'চোখের বিষ। পতন থামছে না। স্টিকে ফিট করা টুইস্ট-গ্রিপ থ্রটল অ্যাডজাস্ট করল ওয়েন। দশ সেকেন্ড।

আয়ুও হয়তো তার বেশি নয়।

যথেষ্ট নিচে নেমে এসেছে ওরা, গম্বুজ আকৃতির সিলিঙের বাইরে বরফ দেখতে পেল। চুর চুর কাঁচের সীমাহীন বিস্তার বলে মনে হলো। দরজা খোলার সাথে সাথে ঝপ্ করে আশি কি নব্বুই ডিগ্রী নেমে যাবে টেমপারেচার, দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইবে। যদি না তলিয়ে যায় কপ্টার, যদি না উল্টে যায়। সিকোরস্কির নিচে স্কিড আছে—স্কি—কপ্টারকে সিধে রাখতে সাহায্য করবে। যদি না একটা স্কি হড়কায়, আর দ্বিতীয়টা দেবে যায়। পাইলট তাকাতে একটা চোখ টিপল রানা। কৌতুকের পাল্টা কোন সাড়া পাওয়া গেল না। গগলসের পিছনে ওয়েনের চোখ ভাবলেশহীন। আতঙ্কে সিঁটিয়ে আছে সে। এই সময় বরফে নামল স্কিড।

সিকোরস্কি টলমল করতে লাগল। রানা অনুভব করল, ওর দিকে কাত হয়ে পড়ছে। পোর্টের দিকে নরম বরফ, স্টারবোর্ডের দিকে কঠিন। ওয়েনের হাত যেন স্টিকের সাথে ঝালাই করা। বিপদ টের পেয়ে গেছে কুকুরগুলো, গলার ভেতর থেকে করুণ ফোঁপানির আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। রোটর ব্লেড এখনও ঘুরছে, ডুবে যাবার অনুভূতিতে কোন ছেদ নেই এখনও। কেবিনের ভেতর উত্তেজনা যেন সশরীরে উপস্থিত, আতঙ্কে তিনজনই ঘামছে দরদর করে। হঠাৎ করেই সিধে হলো মেশিন, স্থির হলো। সুইচ অফ করল ওয়েন, গগলস কপালে তুলল। চকচক করছে ভিজে মুখটা।

'নাইস ল্যান্ডিং,' হেডসেট খুলে বলল রানা, দরজার দিকে হাত বাড়াল। দরজা খুলতেই ছুরি খেলো রানা–ধারাল আর্কটিক ঠাণ্ডা। মুখ ফুলিয়ে গরম বাতাস ছাড়ল রানা, লাফ দিল বরফ লক্ষ্য করে। মাথা নিচু করে খানিকটা দৌড়ে থামল ও, মুখ তুলে তাকাতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। প্রেশার রিজের ওপর নামছে নিয়াজের সিকোরস্কি। ধাক্কা খেয়ে নির্ঘাত বিধ্বস্ত হবে।

রানার পিছনে আনন্দ-উল্লাসে ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুরগুলো, বিনয় ওগুলোকে নামতে সাহায্য করছে। পুব দিকে, সিকি মাইল দূরে, চাঁদের আলোয় ঝুলে থাকতে দেখা গেল ভারী কুয়াশার নিশ্ছিদ্র পর্দা, ধূসর নোংরা মেঘ যেন নিচের বরফে নোঙর ফেলেছে। নিয়াজের সিকোরস্কি একটা প্রেশার রিজের আড়ালে খসে পড়ল, রিজটা মোচড় খাওয়া দশ ফিট উঁচু নিরেট পাঁচিল। বরফে ধাক্কা খেলো স্কিড, রিজের ওপর রোটর ব্লেড ঘুরছে। 'এ-যাত্রা বেঁচে গেল নিয়াজ,' রানার পিছন থেকে বিকৃত শোনাল বিনয়ের গলা। 'মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল...'

'বাঁচেনি—হেলিকপ্টার উল্টে যাচ্ছে!' বরফের ওপর দিয়ে ছুটল রানা, বুটের তলায় কচকচ করে গুঁড়ো হচ্ছে বরফ কুচি। গোটা এলাকা সম্প্রতি জমাট বেঁধেছে, কোথাও উঁচু-নিচু, কোথাও নরম। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে ওর—এখনও রিজের মাথায় দেখা যাচ্ছে রোটর ব্লেড, কিন্তু কাত হয়ে পড়ছে একদিকে। একটা ফাঁক গলে পাঁচিল পেরোল ও, বিপদের মুহূর্তে বিদ্যুৎগতি নিয়াজ এরই মধ্যে খুলে ফেলেছে সিকোরস্কির দরজা, একের পর এক লাফ দিয়ে নিচে নামছে কুকুরগুলো, ছুটে আসছে ফাঁকটার দিকে।

রোমহর্ষক একটা দৃশ্য। সিকোরস্কির একদিকের স্কিড নরম বরফে দেবে যাচ্ছে এখনও, স্ট্রাটের খানিকটা এরই মধ্যে ডুবে গেছে, একদিকে অস্বাভাবিক কাত হয়ে পড়া সত্ত্বেও রোটর ঘুরছে। এরচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্ত হতে পারে না। ছুটে আরও কাছে চলে আসছে রানা, ভাবছে পাইলট ব্যাটা করছে কি! সুইচ অফ করেনি কেন! স্লেজটাকে ঠেলতে ঠেলতে দরজায় উদয় হলো নিয়াজ, ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেবে। 'ওটা ছাড়ো!' রানার চিৎকার যান্ত্রিক গর্জনে হারিয়ে গেল। লাফ দিল ও, আঁচড়া-আঁচড়ি করে উঠে পড়ল কেবিনে। কন্ট্রোলের পিছনে বসে আছে পাইলট, তার দিকে না তাকিয়ে হাতের এক ঝাপটায় সুইচ অফ করল ও।

'না!' প্রতিবাদ জানাল পাইলট। 'আমি টেক-অফ করতে যাচ্ছি...'

'ইঞ্জিন চালু করো, আমি তোমার ঘাড় মটকাব!' শাসাল রানা। 'ওই স্লেজের ওপর আমাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে, হাত লাগিয়ে নামাও ওটাকে। মেশিন গেলে মেশিন আসবে—আমরা গেলে?' নিয়াজকে সাহায্য করার জন্যে ফিরে এল ও। 'আলগোছে,

নিয়াজ। নিচে বরফ স্পঞ্জের মত।’ সিকোরস্কির পাশে বিনয়কে দেখতে পেল ও। ‘বিনয়, কোথায় নামে লক্ষ রাখো, ডুবে যেতে পারে...’

‘তাড়াতাড়ি–পা দেবে যাচ্ছে...’

আস্তে-ধীরে, একটু একটু করে দরজা দিয়ে অর্ধেকটা বের করে দিল ওরা ভারী স্লেজটাকে। লাফ দিয়ে বিনয়ের পাশে নামল রানা, দু’জন মিলে ভারটা সামলাবে। শেষ ক’মুহূর্ত প্রায় স্থির হয়ে থাকল সিকোরস্কি, যদিও কাত হয়ে থাকার ভঙ্গিটা মারাত্মক একটা হুমকির মত, যে-কোন মুহূর্তে উল্টে যেতে পারে। ধীরে ধীরে নিচে নামিয়ে আনা হলো স্লেজ। বরফে চাপ পড়তেই দেবে যেতে শুরু করল। খপ্ করে হারনেস ধরে ফেলল ওরা, টেনে শক্ত বরফের ওপর নিয়ে আসার চেষ্টা করল। প্রেশার রিজের ফাঁকের কাছে পৌঁছুতে পারলে আর ভয় নেই।

পাইলটের দিকে তাকাল রানা। এখনও কন্ট্রোলের পিছনে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। ‘জানের মায়া থাকলে লাফ দাও হে, তোমার কফিন ডুবছে।’

গোঁ ধরে বসেই থাকল পাইলট, রানার কথায় কান দিল না। ‘চেষ্টা করে দেখব, টেক-অফ করতে পারি কিনা।’

‘নেমে এসে এক নজর দেখো না, নাকি বউকে এতই ভালবাসো ইন্সুরেন্সের টাকাটা এখুনি তাকে পাইয়ে দিতে চাও?’

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিচে নামল পাইলট, পা ডুবে যাচ্ছে টের পেয়ে আঁতকে উঠে ছুটে চলে এল রানার পাশে–বরফ এখানে কঠিন। সিকোরস্কি এখন প্রায় সিধে হয়ে গেছে, কারণ পোর্ট সাইডের মত স্টারবোর্ড সাইডের স্কিডও ডুবে গেছে বরফের তলায়।

‘এটা এখন একটা আপদ,’ ঝাঁঝের সাথে বলল রানা। ‘দূর করতে হবে।’

প্রায় রুখে উঠল পাইলট লী রয়, ‘তারমানে?’

‘ওখানে ওটার ওভাবে থাকা চলবে না,’ বলল রানা। ‘হয় তুলতে হবে, নাহয় ডোবাতে হবে। তা না হলে রাশিয়ানরা হেলিকপ্টার থেকে দেখে বুঝে নেবে কোত্থেকে আমরা কুয়াশার ভেতর ঢুকেছি।’ এক সেকেন্ড চিন্তা করল ও। ‘মটর স্টার্ট দিলে কাঁপুনিতেই বোধহয় ডুবে যাবে...’

তীব্র প্রতিবাদের সুরে লী রয় বলল, ‘ওটা সরকারি সম্পত্তি, মি. মাসুদ রানা। একটা টীম আনতে পারলে টেনে তোলা সম্ভব।’

‘অত সময় নেই,’ কঠিন সুরে বলল রানা। ‘সরে থাকো, চেষ্টা করে দেখি তোলা যায় কিনা।’

‘রানা,’ কৌতুকপ্রিয় নিয়াজ মন্তব্য করল, ‘ভেবে দেখো, ওটার সাথে আমাদের লীডারই যদি তলিয়ে যায়...’

কিন্তু রানা ততক্ষণে সাবধানে কেবিনে উঠতে শুরু করেছে। ওর ভারেও সিকোরস্কি দুলল না, বা আরও বেশি বরফের নিচে দাবল না। পাইলটের সীটে বসল ও, ভাল করে দেখে নিল সবাই নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে কিনা। সবচেয়ে দূরে সরে গেছে পাইলট লী রয়, পাঁচিলের ফাঁকটার কাছে। নিয়াজ আর বিনয় অপেক্ষা করছে কাছেই, ঘুরন্ত রোটর ব্লেডের নাগালের ঠিক বাইরে। কাজটায় ঝুঁকি আছে রানা জানে। আর কাউকে এই ঝুঁকি ও নিতে দিত না। কিন্তু সিকোরস্কির একটা ব্যবস্থা না করলেও নয়।

ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার আগে এক মুহূর্ত গুম হয়ে থাকল রানা।

বরফ থেকে যদি তোলা সম্ভব হয়, উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে প্রথম হেলিকপ্টারের পাশে ল্যান্ড করাবে। স্কিডগুলো গাঢ় রঙের কাদাটে তরল বরফে ডুবে গেছে। কাঁপুনি শুরু হলে বেশিরভাগ সম্ভাবনা আরও তলিয়ে যাবে ওগুলো, গোটা হেলিকপ্টার হঠাৎ হুস করে অতল তলে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। তৈরি থাকতে হবে ওকে, কপ্টারটা যেন ওকেও সাথে করে নিয়ে না যায়। বিসমিল্লাহ বলে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, সিকোরস্কি উঠছে। টলমল করল যান্ত্রিক ফড়িং, ইঞ্জিন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোলার চেষ্টা করল ভারী দেহটাকে। তারপরই পোর্ট সাইড নিচু হতে শুরু করল। এত দ্রুত, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল রানা। তারপর কি ঘটেছে, পরিষ্কার মনে করতে পারল না রানা। দরজা লক্ষ্য করে ডাইভ দিল ও, বরফের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ল–সিকোরস্কি ওর ওপরই কাত হয়ে পড়ছে।

সাথে সাথে ব্যাপারটা টের পায়নি রানা। আওয়াজ শুনে মুখ তুলল ও, দেখল রোটর ব্লেড ওর বুক লক্ষ্য করে নেমে আসছে। আতঙ্কের হিম একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়ায়। স্রেফ দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছে ও। হামাগুড়ি দিতে শুরু করে উপলব্ধি করল বুট জোড়া নরম বরফের তলায় ঢুকে গেছে, বুটের ভেতর চুইয়ে ঢুকছে তরল বরফ। হাঁটু জোড়া গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকের কাছে তুলতে চেষ্টা করল ও, বুটসহ পা দুটো আগে মুক্ত করতে হবে। রোটরের আওয়াজ কালা করে দিল ওকে। নাগালের মধ্যেই রয়েছে শক্ত বরফ, কিন্তু হাতের নখ দিয়ে আঁচড় কাটাই সার, এক চুল এগোতে পারল না রানা।

মাথা নিচু করে রোটর ব্লেডের নিচে পৌঁছুল নিয়াজ, ওগুলো আর ছ'ইঞ্চি নেমে এলে ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে তার। আরও নিচু হলো সে, বরফ থেকে রানার হাত তুলে টানল। 'একেই কি বলে যমে মানুষে টানাটানি, রানা?' অবিশ্বাস্য হলেও মিথ্যে নয়, দাঁত বের করে হাসছে নিয়াজ।

'শুয়ে পড়ো,' নিয়াজের পিছন থেকে বিনয় আর সামনে থেকে রানা প্রায় একযোগে চিৎকার করল।

তাই করল নিয়াজ, তার পা ধরে পিছন থেকে গায়ের জোরে টানতে লাগল বিনয়। বন বন করে ঘুরছে ব্লেডগুলো, হঠাৎ অনেকটা নেমে এসে ওদের মাথা ছুঁতে গেল।

টান পড়ায় তরল বরফ থেকে বেরিয়ে এসেছে রানার বুট, ক্রল করে সরে এল ও। দাঁড়াল ওরা, ছুটল। পাঁচিলের গায়ে ফাঁকটার কাছে পৌঁছে থামল, পিছন ফিরল। খক খক করে উঠে থেমে গেল ইঞ্জিন। তরল বরফে সেঁধিয়ে গেছে ফিউজিলাজ। রোটর এখনও ঘুরছে, তবে গতি কমে আসছে দ্রুত। তারপর হঠাৎ, এক নিমেষে, ডুবে যাওয়ার হুস্স্ আওয়াজ তুলে আর্কটিক সাগরে নেমে গেল সিকোরস্কি। এই ছিল, এই নেই। জায়গাটা উল্টো করা গম্বুজের মত দেখতে হয়েছে, নিচ থেকে বুদ্বুদ্ উঠল একরাশ, তারপর উথলে উঠল তরল বরফ।

'সরকারি সম্পত্তি,' মুখ হাঁড়ি করে বলল লী রয়, 'রক্ষা করার আপনারা কোন চেষ্টাই করলেন না। এরজন্যে আপনাদের জবাবদিহি করতে হবে...'

লোকটার পাছায় কষে একটা লাথি মারল নিয়াজ, তার পিছনে দড়াম করে আছাড় খেলো বরফে, কোমরে ব্যথা পাবার ভান করে

খানিক কাতরাল, বিনয়ের অবতার সেজে বলল, 'সত্যি দুঃখিত!'

সাত

যে-কোন সঙ্কটের পর মানুষের মধ্যে সাধারণত একটা জড়তা আসে, নিয়াজের লাথি সেটাকে আসন গাড়তে দিল না। তার ওপর রানার ব্যস্ত তাগাদা তো আছেই। প্রথম সিকোরস্কি থেকে স্লেজ নামাতে হবে, কুকুরগুলোকে স্লেজের সাথে হারনেস দিয়ে বাঁধতে হবে, এলাকা ছেড়ে কুয়াশার ভেতর ঢুকে পড়তে হবে রাশিয়ান প্লেন এসে পড়ার আগেই।

রানা বলল, 'পনেরো মিনিটের মধ্যে কুয়াশার ভেতর হারিয়ে যেতে চাই আমরা।'

সকৌতুক হাসি নিয়ে নিয়াজ বোধহয় আরেকবার ক্ষমা প্রার্থনা বা দুঃখ প্রকাশ করতে যাচ্ছিল, তার মুখের ওপর দড়াম করে কপ্টারের দরজা বন্ধ করে দিল লী রয়, ইঞ্জিন স্টার্ট দিল রিচার্ড ওয়েন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুটো স্লেজ টীম জোড়া লাগানো হলো, খোঁচা দিয়ে দাঁড় করানো হলো কুকুরগুলোকে—হুকুম পেলেই ছুটবে এবার। সিকোরস্কি আকাশ থেকে ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওটা চলে যাবার সাথে সাথেই ভারী কোন বস্তুর মত ওদের তিনজনের ওপর নেমে এল অশরীরী নির্জনতা, উত্তর মেরুর অটুট নিস্তব্ধতা বিস্ফোরণের মত বাজল কানে।

গ্রীনল্যান্ড থেকে একশো মাইল দূরে সম্পূর্ণ একা ওরা। জমাট সাগরে তিনজন মানুষ, আঠারোটা কুকুর, দুটো স্লেজ—সব মিলিয়ে বিশাল বরফ-রাজ্যে পিনের মাথার চেয়ে বেশি কিছু নয়। ওদের

পায়ের নিচে বরফ সম্ভবত বারো ইঞ্চি পুরু, তবে কোথাও কোথাও আধ বা সিকি ইঞ্চি পুরুও নয়। গোটা বরফ-রাজ্য, আর্কটিক, পানির ওপর ভাসছে। দেখে মনে হবে সব কিছুই স্থির হয়ে আছে, কিন্তু আসলে প্রতি মুহূর্তে বরফের সাথে ভেসে চলেছে ওরা। শক্তিশালী গ্রীনল্যান্ড কারেন্ট গোটা বরফ-রাজ্যকে টেনে নিয়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে, আইসবার্গ অ্যালির দিকে–প্রতিদিন দশ মাইল গতিতে। বরফের নিচে দশ হাজার ফিট গভীর সাগর। লিডিং টীমের দায়িত্ব বিনয়ের কাছ থেকে নিজে নিল রানা, বলল, 'আর দেরি নয়। কুয়াশার ভেতর না ঢোকা পর্যন্ত নিরাপদ নই আমরা।'

'আমরা একটু অন্য জাতের মানুষ,' সামনে থেকে সহাস্যে বলল নিয়াজ। 'চেষ্টা করছি কত তাড়াতাড়ি নরকে ঢোকা যায়।'

হাসি চেপে রওনা হয়ে গেল রানা। শুরু করাটাই ঝামেলা। চাবুক খেয়েও নড়তে চায় না কুকুর, নির্মম ঠাণ্ডায় উঠতে চায় না নিজেদের পা। নিয়াজ কিছু বাড়িয়ে বলেনি, কালচে কুয়াশা আকাশ থেকে বরফ পর্যন্ত যেভাবে পাঁচিলের মত ঝুলে আছে, দেখে সত্যি গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়। এ যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত, এরপর কি আছে কেউ জানে না। বাতাস নেই, কিন্তু ঠাণ্ডা যেন অদৃশ্য গরল ঢেলে দিচ্ছে গায়ে। স্থির হয়ে আছে কুয়াশা।

স্থির কুয়াশার ভেতর কি ঘটছে কেউ জানে না। দৃষ্টি চললে দেখা যায় বরফ কোথায় ফাটছে, কোথায় চিড় ধরছে, বা কোথায় দু'পাশের চাপে মাথাচাড়া দিচ্ছে প্রেশার রিজ। কুয়াশার ভেতর সে-সুযোগ নেই। অথচ ভাসমান বরফ কখন যে কি মূর্তি ধারণ করবে কেউ বলতে পারে না। অনেক সময় দেখা গেছে, কুয়াশার

ভেতর গোটা স্লেজ টীম অকস্মাৎ ডুবে গেছে আর্কটিক সাগরে। নিমেষে। হয়তো সরাসরি একটা খাদের মধ্যে পড়েছিল, নয়তো ওখানটায় বরফের আবরণ নামমাত্র ছিল কি ছিল না।

কুকুরগুলোর ওপর নির্দয় না হয়ে উপায় থাকল না। কষে বার কয়েক চাবুক মারার পর হাঁটতে শুরু করল ওগুলো। তারপর ছুটল, তবে তার আগে আরও কিছু চাবুকের বাড়ি জুটল কপালে।

দ্বিতীয় স্লেজ চালাচ্ছে বিনয়, সবার কয়েক ফিট সামনে কম্পাস নিয়ে রয়েছে নিয়াজ। 'এরইমধ্যে নার্ভাস রোগে পেয়েছে এটাকে,' কম্পাসটা উঁচু করে দেখাল সে। অনেক সমস্যার একটা–দুনিয়ার এই অংশে বেঈমানী করার কুখ্যাতি রয়েছে কম্পাসের।

স্লেজ চালানোটা বছর দুয়েক আগে বিনয়ের কাছ থেকেই শিখেছে রানা, এ-ব্যাপারে বিনয় তার ওস্তাদ। কিন্তু শিষ্যের সাথে তাল বজায় রেখে ছুটতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল বিনয়। হয়তো রানাকে ভয় করছে কুকুরগুলো, কিংবা হয়তো ওগুলো তাকে পছন্দ করছে, কারণটা যাই হোক, ঝড়ের বেগে ছুটছে ডগ-টীম। বিনয়ের কুকুরগুলোর নেতার নাম, ওরই দেয়া, তুফান। প্রকাণ্ড, অসুরের শক্তি রাখে গায়ে, ওটাই বাকি কুকুরগুলোকে পথ দেখিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ সে হাঁক ছাড়ল, 'সমস্যা, রানা?'

টীমকে দাঁড় করিয়ে, একদিকে মুখ ঘুরিয়ে রয়েছে রানা। 'চুপ। কি যেন শুনলাম।'

অপেক্ষা করছে সবাই। কুকুরগুলো এদিক ওদিক তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে ব্যাপারটা কি। কোথাও কিছু নেই, না শব্দ, না

নড়াচড়া—শুধু লক্ষ কোটি টন নিস্তব্ধতা চেপে বসছে ওদের ওপর। ফার পারকা আর ফার হুডে বিশাল দৈত্যের মত লাগছে রানাকে, চাঁদের আলোয় অটল একটা মূর্তি। মুখটা পুব দিকে ঘোরানো, খাড়া কান যেন রাডারের খুদে ডানা। কুয়াশার পর্দা কাছেই, মাত্র কয়েকশো গজ সামনে, স্থির ধোঁয়ার মত ঝুলে আছে। আবার শব্দটা শুনতে পেল রানা, অস্পষ্ট রোটরের আওয়াজ বাড়ছে। কাছে চলে আসছে একটা হেলিকপ্টার।

'আইলো রে, আইলো!' নিয়াজের পা যেন বিদ্যুতের গতি পেল, কুয়াশার দিকে খিঁচে দৌড় দিল সে। কেউ হাসল না, নিয়াজের নিজের মুখও শুকিয়ে গেছে। 'কুয়াশার ভেতর...'

'ওরা দেখে ফেলার আগে...,' সপাং করে চাবুক কষে নিয়াজের কথাটা শেষ করল রানা।

বিপদ টের পেয়ে প্রাণপণে ছুটল কুকুরগুলো, ইঞ্জিনের আওয়াজ দ্রুত আরও কাছে চলে এল। আওয়াজটার দিকেই ছুটছে ওরা, ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে কুয়াশার ওপর দিকের শেষ প্রান্তে। কালো পর্দার মাথা থেকে যে-কোন মুহূর্তে বেরিয়ে আসবে রাশিয়ান হেলিকপ্টার। বিনয়ের লীডার কুকুর তুফান রানার পায়ের গোড়ালি লক্ষ্য করে লাফ দিচ্ছে, কিন্তু একবারও স্পর্শ করতে পারছে না, দুটো স্লেজ একই গতিতে ছুটছে। উঁচু-নিচু বরফ, যে-কোন মুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে স্লেজ থেকে পড়ে যেতে পারে রানা। সেরকম কিছু ঘটলে সাহায্য করবে বলে পিছিয়ে এসেছে নিয়াজ, রানার পাশে থেকে ছুটছে সে। দরকার হলে লাফ দিয়ে স্লেজে উঠে হ্যান্ডেলবার ধরবে।

হেলিকপ্টারের আওয়াজ, র‍্যাট-ট্যাট-ট্যাট, একেবারে কাছে

চলে এল। সপাং সপাং চাবুক মারল রানা।

'পাতলা বরফ!' হুঙ্কার ছাড়ল নিয়াজ। সাথে সাথে তোবড়ানো বরফের দিক থেকে স্লেজ ঘুরিয়ে নিল রানা। ঢালটাকে পাশ কাটাবার সময় স্বচ্ছ বরফের পাতলা আবরণের নিচে কালচে পানি দেখা গেল। হেলিকপ্টারের আওয়াজ ঘন ঘন ড্রাম পেটানোর মত শোনাল, তারমানে খুব নিচু দিয়ে উড়ে আসছে ওটা। সামনে পোর্ট সাইডে কাত হয়ে আছে বরফের বিস্তৃতি, স্লেজের গায়ে একটা কাঁধ ঠেকিয়ে উল্টে পড়া থেকে বাঁচাল নিয়াজ। বাধাটা না টপকে, ঘুর পথে পেরিয়ে এল বিনয়। কুয়াশার ভেতর ঢোকার মুহূর্তে রানার মনে হলো মাথার ওপর কি যেন দেখল সে। পরমুহূর্তে কালো কুয়াশা গ্রাস করল ওদেরকে। ওদের পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল বিনয় আর তার স্লেজ।

ঘন অন্ধকার, আলোহীন রাত। মাত্র কয়েক ফিট দূরের কুকুরগুলোকেও পরিষ্কার দেখা গেল না। হ্যান্ডেলবার টেনে ওগুলোকে থামাল রানা। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল ও। ইঞ্জিনের আওয়াজ সরাসরি ওপর থেকে আসছে।

'নিশ্চয়ই রুশ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল নিয়াজ। 'শত্রুবেশে পাকা দোস্ত অতিশয়!'

'রুটিন পেট্রল হতে পারে,' বলল বিনয়। 'এন.পি. সেভেনটিন খুব বেশি দূরে নয়—কপ্টারের জন্যে। আমেরিকানরা কি করছে না করছে দেখার জন্যে প্রায়ই এদিকে আসে বলে শুনেছি।'

আওয়াজটা নড়ছে না, সেই একই জায়গা থেকে আসছে। ওদের মনে হলো, পাইলট বোধহয় দলটাকে দেখতে পাচ্ছে। অথচ তা সম্ভব নয়।

খানিক পর সরে গেল শব্দটা, কিন্তু আবার ফিরে এল। ‘চক্কর দিচ্ছে ওরা,’ বলল রানা।

‘তবু রুটিন হতে পারে,’ বলল বিনয়। ‘অথবা ইভেনকো রুস্তভকে খুঁজতে বেরিয়েছে।’

ফিসফিস করে কথা বলছে ওরা, অথচ তার কোন দরকার নেই।

‘কিংবা আমাকে,’ শান্ত গলায় বলল রানা।

‘ওটাকে যদি কর্নেল বলটুয়েভ পাঠিয়ে থাকে,’ কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম উল্লাসের সুর ফুটিয়ে তুলে বলল বিনয়, ‘তাহলে আমি বাজি ধরে বলতে পারি, তোমাকেই খুঁজছে ওরা, রানা। সেক্ষেত্রে আমার বা নিয়াজের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। কর্নেলের যত রাগ একা তোমার ওপর।’

‘হ্যাঁচা কথা কইছ, সোনার চান,’ ভেংচি কাটল নিয়াজ। পরমুহূর্তে গম্ভীর দেখাল তাকে। ‘রানাকে যদি স্পেশাল সিকিউরিটি খুন করে, নিশ্চয়ই ওরা কোন সাক্ষী রাখবে না।’

হেসে উঠল বিনয়। ‘তবু ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে, মাত্র দু’চার সেকেন্ড হলেও রানার চেয়ে আমাদের আয়ু বেশি।’

ওদের কথা শুনছে না রানা। ইঞ্জিনের আওয়াজের দিকে মনোযোগ। ‘পনেরোটা সাবমেরিন কিলার...’

এন.পি. সেভেনটিন। ঘরগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড ভালুকের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে কর্নেল বলটুয়েভ। চাঁদের আলোয় পথ চিনে শেষ হেলিকপ্টারটা নেমে এল। পেট ফোলা কাকের মত দেখতে একেকটা, সবগুলো এক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। সোভিয়েত কপ্টার ক্যারিয়ার নার্ভা থেকে এল ওগুলো। প্রত্যেকটা

সাবমেরিন কিলারের ভেতর ‘সোনার ডিভাইস’ আছে, একজোড়া চাকার ওপর বসানো।

‘আমি চাই,’ আবার বলল কর্নেল, ‘আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার আকাশে উঠুক ওগুলো। ইভেনকোকে না পাওয়া পর্যন্ত নামা চলবে না। শুধু রিফুয়েলিং দরকার হলে ফিরে আসবে।’

‘কিন্তু, কর্নেল কমরেড, প্রতিটি কপ্টারের জন্যে মাত্র একজন করে পাইলট…,’ জুনায়েভ মিনমিন করে শুরু করল।

তাকে থামিয়ে দিয়ে বরফে পা ঠুকল কর্নেল। ‘যথেষ্ট।’

‘পাইলটদের কি বলব যে মাসুদ রানা…’

‘হ্যাঁ, দেখামাত্র। তবে কোন সাক্ষী রাখা চলবে না।’

ত্রিশ মিনিট পর এক এক করে আকাশে উঠে গেল পনেরোটা সাবমেরিন কিলার। কুয়াশার ভেতর ঢোকার সময় এগুলোরই একটার আওয়াজ শুনেছিল রানা। ও জানে না, কুয়াশা ভেতর ঢোকার আগের মুহূর্তে টেলিফটো লেন্সের সাহায্যে ফটো তোলা হয়েছে ওদের।

প্রতি মুহূর্তে জীবন হারাবার ঝুঁকি থাকলেও, কুয়াশার ভেতর প্রথম কয়েক ঘণ্টা কিছুই ঘটল না। কোন দিকে যাচ্ছে ওরা বোঝার উপায় নেই, অন্য কোন পরিস্থিতিতে দলটাকে থামার নির্দেশ দিত রানা, কুয়াশা সরে না যাওয়া পর্যন্ত ক্যাম্প ফেলে অপেক্ষা করত। কিন্তু বাতাস না থাকায় কুয়াশার ব্যাপারে কিছুই বলা যায় না, তাছাড়া হাতে সময়ও কম। পিছনে দল নিয়ে এগিয়ে চলল রানা, স্লেজের সামনে বেশিরভাগ সময় শুধু সর্দার কুকুরটাকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। ওটা অদৃশ্য হলে সাবধানে সামনে

এগোচ্ছে নিয়াজ, বরফ পরীক্ষা করে সঙ্কেত দিচ্ছে রানাকে।

সিকোরস্কি থেকে নামার পর সেক্সট্যান্টের সাহায্যে তারাগুলোর অবস্থান জেনে নিয়েছিল নিয়াজ, তার হিসেবে যদি মারাত্মক কোন ভুল না থাকে, সিকোরস্কি থেকে মাত্র কয়েক মাইল পুবে গেলেই আই.আই.ফাইভে ওদের পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু শীতের সময় আর্কটিকে কোন হিসেবই নিখুঁত হতে পারে না। নিয়াজ যাই বলুক, রানার মনে সন্দেহ থেকেই গেছে।

উদ্বেগ আর উত্তেজনা হঠাৎ করেই দেখা দিল। কুয়াশা পাতলা হতে শুরু করেছে, নতুন করে হেলিকপ্টারের আওয়াজ শোনা গেল। আচমকা চাঁদের আলো হেসে উঠল, মাথার ওপর থেকে ভেসে সরে যেতে লাগল কুয়াশা। কপ্টারও সেই সাথে কাছে চলে এল। 'হল্ট!' স্লেজের হ্যান্ডেলবার কষে টেনে ধরল রানা। 'চেষ্টা করো কুকুরগুলো যেন নড়াচড়া না করে। নিয়াজ, হ্যান্ডেলবার ধরো।' হ্যান্ডেলবারের সাথে আটকানো কেস থেকে নাইটগ্লাস বের করে স্লেজের কাছ থেকে কয়েক গজ হেঁটে এল ও, মাথার ওপর কুয়াশার পর্দায় বড় একটা গর্ত তৈরি হচ্ছে। এই মুহূর্তে চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, তবে চাঁদের আলো রয়েছে আশপাশে। চোখে নাইটগ্লাস তুলল ও। গর্তের কিনারায় দেখা গেল হেলিকপ্টার, খুব নিচ দিয়ে ঝাপসা একটা ফড়িং আকৃতির ছায়া সরে গেল দ্রুত।

খুব কম সময় পেল রানা, রাশিয়ান কিনা চিনতে পারল না। পরমুহূর্তে আরও একটা কপ্টারের আওয়াজ ভেসে এল। এবার তৈরি ছিল ও, আগেরটার মত একই কোর্সে এগিয়ে গেল দ্বিতীয়টাও, জেড-পড আর পাইলটের হেলমেট আবছাভাবে ধরা পড়ল লেন্সে। 'সাবমেরিন কিলার,' স্লেজের কাছে ফিরে এসে

নিয়াজকে বলল ও। 'দূরে ওদিকে আরও একটা রয়েছে।'

'অভ্যর্থনা কমিটি আর কি,' বলল নিয়াজ। 'কুয়াশার সবগুলো কিনারায় নজর রাখছে।'

'লক্ষণটা একদিক থেকে শুভই বলতে হয়,' স্লেজের দায়িত্ব নিয়ে বলল রানা। 'জেনারেল ফচের ধারণাই ঠিক বোধহয়, ইভেনকো রওনা হয়ে গেছে। একসাথে এতগুলো সোভিয়েত মেশিন এদিকে কখনও আসে বলে শুনিনি।'

'শুভ বৈকি,' কৌতুকপ্রিয় নিয়াজ মন্তব্য করল, 'যদি আমাদেরকে খুঁজতে বেরিয়ে থাকে।'

আবার শুরু হলো এগোনো। প্রায়ই মাথার ওপর কাছাকাছি চলে এল হেলিকপ্টার, তবে কুয়াশার পর্দা আবার জোড়া লেগে যাওয়ায় দেখে ফেলার ভয় থাকল না। কুয়াশা না থাকলে বিপদে পড়ত ওরা, কুয়াশা থাকাতেও বিপদের ঝুঁকি কম নয়। পায়ের নিচে বরফ ভেঙে গেছে, কোথাও ফুলে উঠে খুদে ঢিবির আকার নিয়েছে, কোথাও ফাটল ধরেছে, আবার কোথাও দেবে গেছে নিচের দিকে। প্রতি মুহূর্তে মনে হলো এই বুঝি উল্টে গেল স্লেজ। অস্থির হ্যান্ডেলবারটাকে ধরে রাখতে গিয়ে ব্যথায় টনটন করতে লাগল রানার হাত। একই ভোগান্তির শিকার হলো বিনয়, তবে নিয়াজকে আরও কঠিন পরীক্ষা দিতে হলো। কুয়াশা যখন অন্ধকার রাতের মত গাঢ়, স্লেজের আগে থাকতে হলো তাকে। প্রতিবার সামনে পা ফেলার আগে ইহলোক থেকে বিদায় নিল মনে মনে, 'হে ডিক্টেটর, ভুল আর পাপ যা করেছি সব তুমি মাপ করে দিয়ো...।' জানে, বরফের আবরণ যেখানে ভেঙে গেছে সেখানে একবার পা পড়লেই দশ হাজার ফিট নিচে গিয়ে থামবে ওর

কঙ্কাল।

সত্যিকার বিপদ হত সময়টা যদি হত গরমকাল। তখন ফ্রিজিং পয়েন্টে বা দু'এক ডিগ্রী ওপর দিকে থাকত টেমপারেচার। বেশিরভাগ জায়গাতেই বরফের কোন আবরণ থাকত না। তারপর যদি এরকম কুয়াশা থাকত, স্লেজ নিয়ে বেরুতে হত না–বেরুলে পাইকারী আত্মহত্যা হত সেটা। চলতি ফেব্রুয়ারিতে ফ্রিজিং পয়েন্টের চেয়ে চল্লিশ ডিগ্রী নিচে রয়েছে টেমপারেচার, এক কথায় পৈশাচিক নির্যাতন ভোগ করছে ওরা। লম্বা উলেন আন্ডারঅয়্যার পরে আছে সবাই, ফার দিয়ে কিনারা মোড়া বুটের ভেতর দু'জোড়া করে মোজা, একজোড়া করে উলেন পুলওভার, কিনারায় ফার লাগানো জ্যাকেট, তার ওপর রয়েছে উলফস্কিন পারকা। তবু জমে বরফ হবার মত অবস্থা সবার। হাত আর পায়ে কোন সাড় নেই। হুডের বাইরে মুখের সামান্য যেটুকু বেরিয়ে আছে, অসহ্য ব্যথা।

পাঁচ ঘণ্টা পর প্রথম যাত্রাবিরতি। কুকুরগুলো আটচল্লিশ ঘণ্টায় মাত্র একবার খায়, শুধু ওরা তিনজন স্লেজে বসেই শুকনো মাংস খেয়ে নিল। 'মুখরা রমণী–যত দূরেই যাও তুমি, তার ঘ্যানর ঘ্যানর ঠিকই শুনতে পাবে,' খেতে খেতে মন্তব্য করল নিয়াজ।

রুশ হেলিকপ্টারগুলোর কথা বলছে ও। কখনও কাছে, কখনও দূরে, আওয়াজ আসছেই। ঠিক যেন বেহায়া মাথাব্যথার মত, ছাড়ে না। মেজাজ খিটখিটে হয়ে উঠল বিনয়ের। 'অনেকক্ষণ থেকে মনে হচ্ছে একটাই রয়েছে এদিকে,' বলল সে। 'ভেঙে পড়ছে না কেন? ফুয়েল শেষ হলেও বাঁচতাম।'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল রানা। 'এন.পি. সেভেনটিন থেকে ফুয়েল নেবে ওরা।'

'হ্যাঁরে, বিনয়,' হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠে বলল নিয়াজ। 'শেষ পর্যন্ত তুই জাত খোয়ালি, অ্যাঁ?'

বিষম খাওয়ার অবস্থা হলো বিনয়ের। 'কেন, কি হয়েছে?'

'গলায় দড়ি দে, শালা,' তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বলল নিয়াজ। 'না, দাঁড়া, গলায় দড়ি দিলেও বিপদ, কাঠ কই যে তোকে পোড়াব? ঠিক আছে দড়ি নয়, তুই বরং গলায় আঙুল দে।'

উঠে দাঁড়াল বিনয়, ঘুসি বাগিয়ে এগিয়ে এল। 'কি হয়েছে বলবি, না...?'

'লে বাবা, ভাল করতে চাইলে ভূতে কিলায়,' আহত সুরে বলল নিয়াজ। 'জাত বাঁচাতে চাইলে যা বলছি তাড়াতাড়ি কর–গলায় আঙুল দিয়ে বমি কর। তুমি বৎস গোমাংস ভক্ষণ করিয়াছ!'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থমকে দাঁড়াল বিনয়, তারপর ঝট করে রানার দিকে ফিরল।

রানা গম্ভীর। বলল, 'ইয়ে, মানে, বমি আসলে নিয়াজেরই করা উচিত।'

বিনয় আর নিয়াজ একযোগে জানতে চাইল, 'কেন, কেন?'

'গরুর মাংস নয়, ক্যানে ওটা শুয়োরের মাংস ছিল।' নির্লিপ্ত দেখাল রানাকে। 'খুব সম্ভব আমেরিকানরা ইচ্ছে করে শয়তানীটা করেছে। দেখছ না, ক্যানের গায়ে কোন লেবেল নেই, আগেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।'

বিনয়ের মুখে হাসি আর ধরে না। নিয়াজকে বলল, 'দুঃখিত, দোস্ত। ব্যাপারটা তোর জন্যে বুমেরাং...'

নিয়াজ সে-কথায় কান না দিয়ে রানাকে জিজ্ঞেস করল,

‘তারমানে তুমিও হারাম…?’

দাঁত দিয়ে জিভ কাটল রানা। ‘তওবা! ছাগল।’

‘মানে? ছাগলের মাংস খেয়েছ, নাকি গাল দিচ্ছ?’ মুখ বেজার করে জিজ্ঞেস করল নিয়াজ।

‘খেয়েছি।’

‘কি করে বুঝলে?’

‘স্বাদে আর গন্ধে,’ বলল রানা। ‘দেখোনি, আলাদা একটা ক্যান খুলে খেলাম!’

একসাথে তিনজনই হেসে উঠল ওরা, কারণ খোলা হয়েছিল একটাই ক্যান।

‘চুপ!’ হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল রাখল রানা।

ব্যাপারটা আগে থেকেই ঘটছে, কিন্তু হেলিকপ্টারের আওয়াজে শোনা যায়নি। খাওয়া শেষ করার পরপরই নিয়াজের কাছে থেকে কম্পাসটা চেয়ে নিয়েছিল রানা, রসিকতার ফাঁকে কাঁটাটা সিধে করার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ করেই চক্কর দেয়া বন্ধ করে পুব দিকে চলে গেল কপ্টার। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, হাতে কম্পাস, তাকিয়ে আছে দূরে। কোথাও কোন শব্দ নেই, জমাট বেঁধে আছে নিস্তব্ধতা, তবু আর কেউ শুনতে পেল না আওয়াজটা–শুধু রানা বাদে। অস্পষ্ট একটা আওয়াজ, শুনতে পাবার কথা নয়। মৃদু পানির কলকল।

‘এখুনি ফিরে আসব,’ শান্ত গলায় বলল রানা। ‘যাই ঘটুক না কেন, কেউ এখান থেকে নড়বে না।’

পাঁচ মিনিট পর ফিরে এল রানা। কি ঘটছে বাকি দু’জন কিছুই জানে না। নড়তে নিষেধ করায় বিনয় মনে করল, রানা ভয় করছে

কুয়াশায় পথ হারিয়ে ফেলবে ওরা। ফিরে এসে রানা দেখল স্লেজের পিছনে দাঁড়িয়ে তৈরি হয়ে আছে সে, নির্দেশ পেলেই রওনা হয়ে যাবে। নিয়াজের হাতে কম্পাসটা ধরিয়ে দিল রানা। ‘আপাতত এটা তোমার কোন কাজে আসছে না। আমরা কোথাও যাচ্ছি না। ছোট একটা বরফের টুকরোর ওপর রয়েছি, আইসফিল্ড থেকে দূরে সরে যাচ্ছে টুকরোটা...’

‘তা কি করে হয়!’ স্তম্ভিত বিস্ময়ে বলল নিয়াজ। ‘বরফ ভাঙলে বোমা ফাটার আওয়াজ হবার কথা!’

‘বোমা ফাটার আওয়াজ হতে হবে তার কোন মানে নেই,’ বলল রানা। ‘তবে আওয়াজ ঠিকই হয়েছে, কপ্টারগুলো যখন কাছাকাছি ছিল—তাই শোনা যায়নি।’ হাত নেড়ে চারদিকটা দেখাল ও। ‘যেদিকেই হাঁটো, ত্রিশ গজ এগোলে পানিতে পড়বে। আমরা পোলার প্যাকে নেই আর—সাগরে রয়েছি।’

সম্ভাব্য বিপদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপটা ঘটে গেছে। বিশাল আইসফিল্ড দু’ফাঁক হয়ে গেছে, বরফের আবরণ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে সাগর, চওড়ায় সেটা কয়েক মাইলও হতে পারে। কখনও বাতাস, আবার কখনও বরফের তলায় বিরতিহীন স্রোত ফাটল ধরিয়ে দেয় আইসফিল্ডে। ওদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, উন্মোচিত খালের দু’ভাগের কোন এক ভাগে ছিল না ওরা, ছিল মাঝখানের ছোট্ট একটা বরফ টুকরোর ওপর। খালটা যদি সাগরের সাথে মিশে না থাকে, আগে বা পরে এই ফাঁক আবার জোড়া লাগবে। জোড়া যদি না লাগে, ভাসতে ভাসতে মহাসাগরে গিয়ে পড়বে ওরা, তখন নিষ্প্রাণ কঠিন মূর্তিতে পরিণত হওয়াটাকে ভাগ্যের

একমাত্র লিখন বলে ধরে নিতে হবে।

দু'পাশ থেকে বিশাল আইসফিল্ড জোড়া লাগার জন্যে এগিয়ে আসছে, সেটাই রানার উদ্বেগের কারণ। দুই কিনারা আস্তে-ধীরে এগিয়ে এসে পরস্পরের সাথে মিলবে, ব্যাপারটা সেভাবে ঘটে না। দ্রুতগামী দুটো ট্রেন মুখোমুখি ধাক্কা খেলে যা হয়, তারচেয়ে শতগুণ ভয়ঙ্কর হবে এই পুনর্মিলন। সংঘর্ষের আওয়াজ বহু মাইল দূর থেকে শোনা যাবে, যেন একসাথে গর্জে উঠবে এক হাজার কামান। ফুলে-ফেঁপে উঠবে বরফ, চোখের পলকে তৈরি হবে গতিশীল প্রেশার রিজ, একেকটা ত্রিশ গজ বা তারও বেশি উঁচু হয়ে উঠবে, তারপর চূড়া থেকে পাথর-বৃষ্টির মত ঝরে পড়বে আলগা বরফের শত সহস্র ভারী চাঁই। আইসফিল্ড যখন জোড়া লাগবে, মাঝখানের টুকরোটার অবস্থা কি হবে? স্রেফ কাগজের মত চ্যাপ্টা হয়ে যাবে দু'পাশের চাপে। সেজন্যেই ওদেরকে প্রতি মুহূর্ত সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে রানা।

এ-ধরনের প্রাকৃতিক বিপদ ঠেকাবার ক্ষমতা মানুষের নেই, বিপদ এসে পড়লে করারও কারও কিছু থাকে না। তবু দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা কখনোই হতাশায় মুষড়ে পড়ে না, করার কিছু না থাকলেও সতর্ক থেকে বিপদের আকার-আকৃতি চাক্ষুষ করার জন্যে তৈরি হয়। খুদে বরফ টুকরোর দুই কিনারায় পাহারা বসাল রানা, এক প্রান্তে বিনয়কে, আরেক প্রান্তে নিয়াজকে। একটা স্লেজের সাথে দুই প্রস্থ রশি বাঁধা হলো, রশির শেষ প্রান্ত দুটো থাকল নিয়াজ আর বিনয়ের কাছে। আইসফিল্ড কাছে চলে আসছে দেখলে কুয়াশার ভেতর দিয়ে পথ চিনে তাড়াতাড়ি স্লেজের কাছে ফিরে আসতে পারবে ওরা।

দু'জনকে পাহারায় পাঠিয়ে দিয়ে কুকুরগুলোকে খাওয়াতে বসল রানা। ক্যান থেকে মাংস বের করে ছুঁড়ে দিল, শান্তভাবে খেতে শুরু করল ওগুলো। সময় হয়নি, তবু সামনে বিপদ টের পেয়ে আগেভাগে পেট ভরে নিতে আপত্তি করল না কেউ।

খুদে দ্বীপ ওদেরকে বুকে নিয়ে মন্থরগতিতে ভেসে চলেছে। খোলা সাগরের দিকে কিনা জানার উপায় নেই। ওরা যে ভাসছে, বা ভাসতে ভাসতে এগোচ্ছে, সেরকম কোন অনুভূতি হলো না। আজ রাতে বাতাস নেই। তবে জানা কথা স্রোতের টানে সমান গতিতে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলেছে টুকরোটা, আই.আই.ফাইভের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে আসছে ওরা।

বরফের কিনারায় বসে সামনেটা দেখার চেষ্টা করছে বিনয়। ঘন কুয়াশা, কি ছাই দেখবে। ছয় ফিট, ব্যস, তার বেশি দৃষ্টি চলে না। চারদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। কুয়াশা ভেদ করে আইসফিল্ড আসবে চলমান প্ল্যাটফর্মের মত, একেবারে হঠাৎ করে। কঠিন, ইস্পাতের মত শক্ত হবে তার কিনারা। হয়তো তার আগে আগে আসবে ছোট ছোট কিছু ঢেউ। পানি লাফিয়ে উঠে বুট ছুঁলেই বুঝতে হবে, এসে গেছে।

কুয়াশার সামনে কালো পানি যেন পানি নয়, ভেসে থাকা তেল। ফ্রিজিং পয়েন্ট থেকে প্রায় পঞ্চাশ ডিগ্রী নিচে টেমপারেচার। প্রতি মুহূর্তে জমে বরফ হয়ে যেতে চাইছে পানি, বরফের নতুন আবরণ সৃষ্টি হতে চাইছে–কিন্তু বাধা দিচ্ছে স্রোতের অব্যাহত ধারা। পিছন দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়াল বিনয়, কালচে বাষ্পের মত কুয়াশা ছাড়া দেখল না কিছু। সন্দেহ হলো, রানা, নিয়াজ, স্লেজ, কুকুর–সব আছে তো? নাকি টুকরোটার ওপর একা ভাসছে

সে? আশ্চর্য নির্জন লাগল পরিবেশটা, গোটা পৃথিবীতে যেন সে একা বেঁচে আছে।

গা শিরশির করে উঠল। কিছুই অসম্ভব নয়। ছোট টুকরোটা হয়তো আবার মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে গেছে—এক ভাগে সে একা, আরেক ভাগে ওরা। ওদের নতুন টুকরোটা হয়তো আকারে ছোট, স্রোতের টানে দ্রুত এগিয়ে গেছে, পিছিয়ে পড়েছে তারটা। চিৎকার করে রানাকে ডাকতে ইচ্ছে হলো তার। অনেক কষ্টে সামলে রাখল নিজেকে। ও ভয় পেয়েছে জানতে পারলে হেসে কুটি কুটি হবে নিয়াজ। লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। আর রানা? দুঃখ পাবে সে। বিনয় মুখার্জি অসমসাহসী যুবক, এ-কথা জানে বলেই এই অভিযানে নিয়েছে সে তাকে। নির্বাচনে ভুল হয়েছে বুঝতে পারলে দুঃখ তো পাবেই।

কাজে মন দিল বিনয়, ভয় তাড়াবার সবচেয়ে ভাল উপায়। কাজ বলতে কান দুটোকে খাড়া করে রাখা। ওদের এই টুকরোটা যদি ভাঙতে শুরু করে, ক্ষীণ একটু হলেও আওয়াজ হবে। টুকরোটা খুব যদি পাতলা হয়, সে-আওয়াজ নাও শোনা যেতে পারে। মুশকিল হলো, কতটা পাতলা ওরা জানে না। বরফের কিনারায় হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে নিচু হলো সে, যেন তৃষ্ণার্ত কোন পশু নদীতে মুখ দিয়ে পানি খেতে চাইছে। কুয়াশার ভেতর তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল সে। বুটের ভেতর পা ব্যথা করছে, অসাড় হয়ে গেছে হাত। শুধু মৃত্যুভয় সজাগ রাখছে ওকে।

আওয়াজটা হঠাৎ করেই এল।

কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়াল বিনয়, উত্তেজনায় ইস্পাত হয়ে গেছে পেশী। সত্যি একা হয়ে গেছে সে। ভেঙে আলাদা হয়ে গেছে

টুকরোটা। চারদিকের যেদিকেই দু'পা এগোবে, ঝপ্ করে পড়তে হবে কালো পানিতে। তিন মিনিটের মধ্যে ভবলীলা সাঙ্গ। আতঙ্কিত হয়ে ঝট্ করে ঘুরল সে। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল, বাঁচার কোন না কোন উপায় বেরুবেই। অন্তত নিয়াজ আর রানা তাকে...

টান পড়ল রশিতে। ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছিল সে। বরফের টুকরো ভাঙেনি, এখনও ওরা একসাথেই আছে। ধীরে ধীরে নিচু হলো সে, বরফের ওপর বসল। বুটের চাপ লেগে বরফ ভাঙার শব্দ হলো, ঠিক এই শব্দই খানিক আগে শুনেছিল সে। আতঙ্ক কেটে যাওয়ায় দুর্বল আর বোকা লাগল নিজেকে।

বোধহয় ঘণ্টাখানেক হলো ভেসে চলেছে ওরা। ক্লান্তি লাগছে।

আরও চব্বিশ ঘণ্টা পর জোড়া লাগল আইসফিল্ড।

রানার ঘড়িতে রাত সাড়ে দশটা। টলমল করছে বরফের টুকরো, ঘুরছে—উল্টোমুখী একটা স্রোতের মধ্যে পড়ে গেছে। পুব দিকে পাতলা হচ্ছে কুয়াশা। ঝট্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল নিয়াজ। 'ওদিকটা যেন পরিষ্কার লাগছে,' হাত তুলে দেখাল সে। 'সৌভাগ্য, তুমি আরেকবার আসিয়া, যাও মোরে হাসাইয়া...,' রানার দিকে ফিরল সে। 'রানা, এবার বোধহয় কিছু একটা দেখতে পাব, কি বলো?'

'এখনই দেখতে পাচ্ছি আমি,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'তীর বলে মনে হচ্ছে।'

শব্দটা নিজের অজান্তেই ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। ঝাপসা রেখা যেটা দেখতে পাচ্ছে, বরফের কিনারা ছাড়া আর কিছু হতে

পারে না। নাকি রেখাটা ওর কল্পনা, দৃষ্টিভ্রম? কুয়াশার দিকে একটানা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে নানা ধরনের কৌতুক শুরু করে দেয় দৃষ্টি—গাছপালা, পাহাড়, আরও সব অসম্ভব বস্তু দেখিয়ে তামাশা করে। চোখ বন্ধ করে আবার খুলল রানা। দ্রুত পাতলা হয়ে আসছে কুয়াশা, ফাঁক পেয়ে চাঁদের আলো অনেক নিচে নেমে আসার সুযোগ পাচ্ছে। হ্যাঁ, রেখাটা ঝাপসা হলেও আছে এখনও। কিন্তু ওটা কি স্থির কিছু? স্রোতের ধারা বদলে যাওয়ায় ওরা কি ধীরে ধীরে স্থির আইসফিল্ডের দিকে এগোচ্ছে?

নিয়াজের গলা তিক্ত শোনাল, 'মনে হচ্ছে এদিকেই আসছে ওটা।'

পানির ওদিকে সিকি মাইল বা তারও কম দূরে ওটা, সাদা একটা প্ল্যাটফর্ম- দেখতে মহাদেশের কিনারার মত। কিনারার সামনে ছায়া ছায়া ভাঁজ, সম্ভবত ছোট ছোট ঢেউ। পশ্চিম দিকে, ওদের দিকে আসছে। 'নিয়াজ, চোখ রাখো। বিনয়কে বলি আমি।'

রশি ধরেই এগোল রানা, যদিও তার কোন দরকার নেই আর। কুয়াশা যথেষ্ট পাতলা হয়ে এসেছে। খুদে দ্বীপের অপর প্রান্তে ঝাপসা মূর্তির মত দেখা গেল বিনয়কে। দ্বীপের কিনারা থেকে কয়েকশো গজ দৃষ্টি চলে, তারপর আবার ঘন কুয়াশার পর্দা। 'ওদিক থেকে আইসফিল্ড এগিয়ে আসছে, বিনয়।'

'বিপদ?'

'বিপদ। কুকুরগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে, পারলে যেন এখুনি লাফ দেয়। তুমি বরং এখানেই থাকো। কিছু যদি ঘটে, ডাক পেলেই ঝেড়ে দৌড় দেবে।'

কিছু যদি ঘটে…তারমানে, রানার সন্দেহ, একদিক থেকে নয়,

দু'দিক থেকে এগিয়ে আসছে আইসফিল্ড। টুকরোটার মতিগতি ভাল ঠেকছে না ওর। ধীরে ধীরে ঘুরছে, তারমানে একাধিক স্রোতের পাল্লায় পড়েছে। কুকুরগুলোর সাথে খানিকক্ষণ কাটিয়ে নিয়াজের কাছে ফিরে এল রানা।

'ঢেউগুলো দেখো,' বলল নিয়াজ।

কাছে চলে আসায় ছায়া ছায়া ভাঁজগুলোকে এখন পরিষ্কার ঢেউ বলে চেনা যাচ্ছে। এখনও ছোট দেখাচ্ছে ওগুলোকে, তবে ওগুলোর পিছনে যে লক্ষ কোটি টন পোলার প্যাকের ধাক্কা কাজ করছে সেটা পরিষ্কার। আরও পাতলা হয়েছে কুয়াশা, কিন্তু আইসফিল্ডের আরও সামনে দৃষ্টি চলে না। সাদা প্ল্যাটফর্মটাকে গোটা একটা উপকূল মনে হলো, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বরফের উঁচু পাহাড় আর জমাট প্রেশার রিজ।

'রানা...!'

বিনয়ের চিৎকারে ঝট্ করে ঘুরল রানা। একটা, মাত্র একটা ঢেউ ওদের খুদে দ্বীপের কিনারা টপকে উঠে এল। পিছন দিকে, বিনয়ের পায়ের কাছে। আরও সামনে তাকাল রানা—আইসফিল্ডের আরেক চোয়াল এগিয়ে আসছে মৃদুগতিতে। ঠিক এই ভয়ই করেছিল ও। 'চলে এসো!' ওর চিৎকার শুনে দৌড় দিল বিনয়। আধ পাক ঘুরে পুব দিকে তাকাল রানা। প্রলয় ঠেকানো সম্ভব নয়, সাথে সাথে উপলব্ধি করল ও। আইসফিল্ডের পশ্চিম চোয়াল প্রথম কামড় বসাবে, তারপরই ওরা পুব চোয়ালের নাগালের মধ্যে পড়ে যাবে।

সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে এক সেকেন্ডও অনেক বেশি সময় এখন। রানা ঠিক করল, পুব দিকের আইসফিল্ডে যেতে পারলে

ভাল হয়। ‘কুকুরগুলোকে সামলাও, নিয়াজ!’ পিছনে একটা শব্দ হলো, ঘাড় ফেরাতেই দেখল ঢেউগুলো দ্বীপের গায়ে ভাঙছে, কালচে পানিতে ভেসে যাচ্ছে বরফ। বিনয়ের বুট ডুবে গেছে এরইমধ্যে। কাছে পৌঁছুবার আগেই ওরা দেখল, কুকুরগুলোর পা ডুবে গেছে, ক্যাঙ্গারুর মত লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে ওগুলো, হারনেস টেনে ধরেও শান্ত করা যাচ্ছে না।

‘পিছনের ফিল্ড ঠেলে নিয়ে যাবে…,’ চেঁচিয়ে বলল রানা।

নিজের স্লেজের দায়িত্ব নিয়ে কুকুরগুলোকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে বিনয়। দ্বিতীয় স্লেজের হ্যান্ডেলবার ধরেছে রানা এক হাতে, আরেক হাতে চাবুক। ওদের চারপাশে কলকল করে বয়ে যাচ্ছে পানির স্রোত। পায়ের নিচে বরফ থাকলেও দেখা যাচ্ছে না, মনে হলো সাগরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। কুকুরগুলো ভাবল ডুবে যাচ্ছে তারা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটতেও হয়তো তাই যাচ্ছে। নির্ভর করে যে বরফে ওরা দাঁড়িয়ে আছে সেটা কতটুকু পুরু, কতটুকু তার সহ্যক্ষমতা। পিছন থেকে যে বিশাল বরফ প্রান্তর এগিয়ে আসছে সেটা যদি টুকরোটার কোন দুর্বল জায়গায় প্রথম ধাক্কাটা মারে, নিমেষে দু’টুকরো বা সহস্র টুকরো হয়ে যেতে পারে। অথবা একপলকে একরাশ পাউডার হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে চারদিকে। পানিতে পড়ে ঠাণ্ডায় জমে বরফ হবার সুযোগও মিলবে না, দুই আইসফিল্ডের চাপে…

পুব চোয়াল এখনও একশো গজ দূরে, ঢেউগুলো ওদের কাছে এসে পৌঁছায়নি, এই সময় সংঘর্ষ ঘটল–যাকে বলে রাম ধাক্কা, ওদের নিচে কেঁপে উঠল বরফ। বিকট আতঙ্কে স্থির হয়ে গেল কুকুরগুলো। তীব্র স্রোত বয়ে গেল খুদে দ্বীপের ওপর দিয়ে, নিচু

আর তোবড়ানো জায়গাগুলোয় পানি রেখে গেল। এতক্ষণে অনুভব করল ওরা, বরফের ভেলা ভেসে চলেছে। এক আইসফিল্ড সেটাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে আরেক আইসফিল্ডের দিকে। ঘাড় ফেরাল রানা, পিছনের এগিয়ে আসা আইসফিল্ডের কিনারা ওদের ভেলার চেয়ে ফিটখানেক বেশি হবে উঁচু, প্রকাণ্ড একটা ধাপের মত। 'ওদিকের কিনারায়!' ওর কণ্ঠস্বর বিস্ফোরিত হলো।

নির্দয় হয়ে উঠল বিনয় আর রানা। সপাং সপাং চাবুকের বাড়ি খেয়ে খেপে উঠল কুকুরগুলো। প্রায় উড়ে চলল স্লেজরথ। কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল কুকুরগুলো। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল রানার। উচিত ছিল পিছন থেকে এগিয়ে আসা চোয়ালের দিকে যাওয়া, কিন্তু এখন ভুল সংশোধন করার সময় নেই। পুব দিকের ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে ভেলার ওপর, পা ডুবে যাওয়ায় আবার পাগলা হয়ে গেল কুকুরগুলো। বজ্রকঠিন হাতে হ্যান্ডেলবার ধরে থাকল রানা, আরেক হাতে চাবুক উঁচিয়ে ধরেছে। পায়ের চারপাশ থেকে পানি সরেনি, এই সময় ফাঁকটা জোড়া লাগল। স্লেজ দুটো পাশাপাশি রয়েছে। চিৎকার করতে করতে হুডের ভেতর ফুলে উঠল ওদের মুখ। বিনয় আর রানার হাতে তীক্ষ্ণ শব্দে লকলকিয়ে উঠল চাবুক। সংঘর্ষের ঠিক আগের মুহূর্তে লাফ দিল কুকুরগুলো। পায়ের নিচে সম্পূর্ণ ডুবে গেল ভেলা, হাঁটুর কাছে উঠে এল পানির স্তর।

প্রলয়ংকরী সংঘর্ষ ঘটার আগেই ফাঁকটা পেরিয়ে এল স্লেজ জোড়া। তারপরই শোনা গেল দুনিয়া কাঁপানো বিস্ফোরণের আওয়াজ। আইসফিল্ডের কিনারা থেকে বেশ খানিকদূর সমতল বরফ প্রায় মসৃণ, পিছলে ছুটে চলল স্লেজ। বিস্ফোরণের আওয়াজে

কানে তালা লেগে গেছে ওদের, আইস শীটের মুখোমুখি ধাক্কায় প্রেশার রিজ তৈরি হতে দেখল ওরা, কিন্তু কোন আওয়াজ শুনতে পেল না। ছোট বাড়ি আকারের বরফের অসংখ্য টুকরো সদ্য তৈরি চওড়া পাঁচিলের মাথায় টলমল করছে। রানার পাশে থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ছোটার সময় পা পিছলে পড়ল নিয়াজ। তার পিছনে প্রেশার রিজ ধেয়ে এল ছুটন্ত লাভার মত, লাভার সামনে এক দেড়শো মণ ওজনের বরফের চাঁই একের পর এক আছড়ে পড়ছে।

'রানা...!' এক নিঃশ্বাসে বলল নিয়াজ, 'থেমো না...!' ক্ষীণ, কিন্তু পরিষ্কার, করুণ হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটে।

তাকে পড়তে দেখল রানা, হ্যান্ডেলবার আর চাবুক ধরল একহাতে, নিয়াজের বাড়ানো হাতটা ধরে ফেলল খপ্ করে। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে খানিকটা উঁচু হয়েছে নিয়াজ, নির্দয়ভাবে তার হাত টানল রানা। স্প্রিঙের মত খাড়া হলো নিয়াজ, হোঁচট খেতে খেতে স্লেজের সাথে ছুটল আবার। ওদের পিছনে বিশ টন ওজনের বরফের একটা চাঁই পড়ল, ঠিক যেখানে আছাড় খেয়েছিল নিয়াজ। আরও পিছনে, আইসফিল্ড যেখানে জোড়া লেগেছে, বরফের সহস্র চাঁই যেন জ্যান্ত হয়ে উঠে পরস্পরের সাথে বাধিয়ে দিয়েছে তৃতীয় মহাযুদ্ধ।

নরম বরফ চিরে এঁকেবেঁকে ছুটল ফাটল। রানার স্লেজের পাশে ধস নামল, বিকট চড়চড় শব্দের সাথে তৈরি হতে হতে ছুটল গভীর একটা খাদ, ভেতরে কালচে পানি পারদের মত টলটল করছে। স্লেজের নাক ঘোরাল রানা, পরমুহূর্তে আরও একটা ফাটলকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে দেখে আবার দিক বদল করতে হলো।

চারদিকে ধ্বংস প্রলয় শুরু হয়ে গেছে, একনাগাড় বোমাবর্ষণের মত আওয়াজে চাপা পড়ে গেল ওদের গলা ফাটানো চিৎকার আর চাবুকের সপাং সপাং। হঠাৎ করেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে দুঃখবোধ করল রানা। চাবকাবার কোন দরকারই নেই, প্রাণের মায়ায় সবটুকু শক্তি নিয়ে ছুটছে কুকুরগুলো। আধ মাইল চলে এল ওরা, সামনে কুয়াশার কিনারা, হাত তুলে সবাইকে থামতে নির্দেশ দিল রানা। কুকুরগুলোর অনুকরণে বেদম হাঁপাচ্ছে ওরা। পারকার ভেতর কাপড়চোপড় চটচট করছে ঘামে। পিছন দিকে তাকাল ওরা। এখনও তাণ্ডবলীলায় মেতে আছে আইসফিল্ড। নিষ্প্রাণ দানবদের লঙ্কাকাণ্ড চলতেই থাকবে এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

'কারা ওরা!'

ফার মোড়া তিনটে আকৃতি, কুয়াশার ভেতর ঝাপসা দেখালেও মানুষ বলে চিনতে ভুল হয় না। মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল, তারপরই স্ক্রীনে শুধু ঘন কুয়াশা ছাড়া আর কিছু নেই।

এন.পি.সেভেনটিনের একটা ঘরে বসে আকাশ থেকে টেলিস্কোপিক লেন্স লাগানো মুভি ক্যামেরায় তোলা ছবি দেখছে ওরা। ঘন ঘন পাইপ টানছে কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ, কিন্তু অনেক আগেই সেটা নিভে যাওয়ায় ধোঁয়া বেরুচ্ছে না।

'আশ্চর্য তো!' মন্তব্য করল জুনায়েভ।

চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে পা ঠুকল কর্নেল। 'কিছুই বোঝা গেল না,' বলল সে। 'কুয়াশার কিনারায় তিনজন মানুষ, একজোড়া ডগ-টীম। রানার দল তাহলে কোথায়? আর্কটিকে অভিযানে বেরুলে দলে কম করেও পঞ্চাশ জন লোক, দু'ডজন স্লেজ

থাকবে–কোথায় সে-সব?' হঠাৎ হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'মাথামোটা পাইলটরা ঠিক জায়গায় খোঁজ করেনি।'

থপ থপ পা ফেলে টেবিলে বিছানো ম্যাপের সামনে দাঁড়াল কর্নেল। আর্কটিকের নিচের দিকে মনোযোগ দিল। এলাকার সমস্ত জলযানের অবস্থান চিহ্নিত করা আছে ম্যাপে–ট্রলার ফ্লীট এম.সিক্সটি-নাইনের ছটা জাহাজ, কপ্টার ক্যারিয়ার নার্ভা, বিশাল রিসার্চ শিপ রিগা, এবং আমেরিকান আইসব্রেকার কিউট। সবগুলোই সমান গতিতে এগোচ্ছে আইসফিল্ডের দিকে।

ম্যাপের পাশে আই.আই.ফাইভের ব্লো-আপ, আকাশ থেকে তোলা। চার হপ্তা আগে ধরাবাঁধা কাজের অংশ হিসেবে তোলা হয়েছিল ছবিটা। 'আই.আই.ফাইভে আমাদের স্যাবোটাজ টীম ইতিমধ্যে পৌঁছে যাবার কথা, তাই না, জুনায়েভ?'

ঘড়ি দেখল জুনায়েভ, রাত সাড়ে দশটা। তার জানার কথা নয়, ঠিক এই সময় পঁচিশ মাইল পশ্চিমে ফাটল ধরা আইসফিল্ড জোড়া লাগার জন্যে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে, মাঝখানে রানা আর তার দল। 'আমাদের টীম এক ঘণ্টা আগেই ওখানে পৌঁছে গেছে,' বলল সে। 'কুয়াশা থাকলেও, রাডারের সাহায্যে আমেরিকান বেস পেয়ে গেছে ওরা।'

'শুধু কিন্তু র‍্যাম্প নয়, এয়ারস্ট্রিপও,' বলল কর্নেল। 'ওটাও অকেজো করে দিয়ে আসতে হবে।'

'সেরকম নির্দেশই দেয়া হয়েছে ওদের,' কর্নেলকে আশ্বস্ত করল জুনায়েভ।

'মনে আছে তো, কোন রকম ইন্টারন্যাশনাল ইনসিডেন্ট বরদাস্ত করব না আমি!' চোখ পাকাল কর্নেল।

‘যাই ঘটুক, দেখে মনে হবে অ্যাক্সিডেন্ট–অথবা অ্যাক্সিডেন্টের মিছিল। আশা করছি আর ত্রিশ মিনিটের মধ্যে বাইরের দুনিয়ার সাথে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে আই.আই.ফাইভ।’

‘কিন্তু যদি ওদের অয়্যারলেস হাট অক্ষত থাকে?’

‘থাকবে না, কর্নেল কমরেড। ওটাকেও বরফের সাথে মিশিয়ে দিয়ে আসবে ওরা।’

কিন্তু জুনায়েভের কথা কর্নেলের কানে ঢুকল না। ‘মাসুদ রানা,’ আপন মনে বিড়বিড় করছে সে, ‘এসেছ যখন, তোমাকে আমি ঠিকই খুঁজে বের করব। কত ধানে কত চাল বুঝবে তখন। তালুতে তোমার মগজ নিয়ে চটকাতে না পারলে আমার শান্তি নেই।’

‘তুমি বোধহয় ভুল করছ…’

‘পুবদিকে যাব আমরা,’ এবার নিয়ে কথাটা দু’বার নিয়াজকে বলল রানা। ‘তাহলে পৌঁছুতে পারব আই.আই.ফাইভে।’ হাত কাঁপছে, অনেক কষ্টে একটা সিগারেট ধরাল ও। প্রথম টানটাই বিস্বাদ লাগল–সিঁধেল চোরের মত কোথাও ঢুকতে বাকি রাখেনি কুয়াশা, ফুসফুসেও ঢুকেছে। দু’মিনিট ধরে তর্ক চলছে ওদের–কোন্ দিকে যাওয়া উচিত তাই নিয়ে।

‘বরফের ভেলায় চড়ে অনেক দক্ষিণে সরে এসেছি আমরা,’ নিজের যুক্তিতে এখনও অটল নিয়াজ। ‘নেভিগেটর হিসেবে আমি বলছি…’

‘শুনেছি, কিন্তু তোমার সাথে আমি একমত নই,’ শান্ত সুরে

বলল রানা। 'সব কিছুই দক্ষিণ দিকে ভেসে চলেছে, খুব দ্রুতই বলা চলে। আইসফিল্ড, আই.আই.ফাইভ, এন.পি.সেভেনটিন, আমরা যে ভেলায় ছিলাম—স-ব। প্রত্যেকটা একই গতিতে। কাজেই ভেলা কতটুকু ভাসিয়ে এনেছে, সে হিসেব বাদ দিতে পারো তুমি।'

'একটা পয়েন্ট পর্যন্ত তোমার কথা ঠিক...'

'আমার কথা নয়, আমার হিসেব—নির্ভুল। তাছাড়া, নিয়াজ, এখানে কোন পার্লামেন্ট অধিবেশন বসেনি। কাজেই তর্ক বাদ দিতে পারো। এখুনি আমরা রওনা হব, ওই পুব দিকেই।'

যুক্তিতে হেরে গিয়েই হোক, বা নেতার প্রতি সম্মান দেখিয়েই হোক, স্যালুট ঠুকে হাসল নিয়াজ। 'ইয়েস, বস্!'

ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে আবার শুরু হলো যাত্রা। পায়ের নিচে উঁচু-নিচু বরফ। যখন যে স্লেজ উল্টে পড়ার উপক্রম করে তখুনি সেটার দিকে ছুটে গিয়ে ঠেক দেয়ার চেষ্টা করল নিয়াজ। কয়েক মিনিট পরই স্থির দাঁড়িয়ে থাকা প্রেশার রিজ পথরোধ করল ওদের। যেন চীনের প্রাচীন, ঘুরে যাবার উপায় নেই। শাবল আর কোদাল হাতে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনজন, পাঁচিল ভেঙে পথ তৈরি হলো। হলো বটে, কিন্তু কাজটা সমস্ত শক্তি যেন চুষে বের করে নিল ওদের। তবে কোমরে টনটনে ব্যথা নিয়েও হাসাবার কাজটা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করল নিয়াজঃ 'দাদা তোর পায়ে পড়ি রে, মেলা থেকে বউ এনে দে...'

'মেলা?' খেঁকিয়ে উঠল বিনয়। 'শালার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

একদিক থেকেই শুধু ভাগ্যটা ভাল ওদের, এখন পর্যন্ত

হেলিকপ্টারের কোন আওয়াজ পায়নি।

'মনে হচ্ছে রাশিয়ানরা হাল ছেড়ে দিয়েছে,' স্লেজ নিয়ে পাঁচিলের ফাঁক গলার সময় বলল বিনয়। 'কিংবা ফুয়েল শেষ হয়ে গেছে...'

'তোরা যে যাই বলিস ভাই, আমার ট্রিপল ফাইভ চাই,' দ্বিতীয় স্লেজের পাশাপাশি ছুটছে নিয়াজ, বিনয়ের বুকের কাছে হাত পাতল।

ওদের কথা শুনছে না রানা। ভাবছে বাকি রাতের জন্যে এখানেই ক্যাম্প ফেলবে কিনা। সাড়ে এগারোটা বাজে, সবাই ক্লান্ত। নিয়াজের দিকে তাকাল ও। তার হুডের ওপর গগলস, লেন্সে নিরেট বরফের আবরণ। প্রতিটি নিঃশ্বাস বেরিয়ে এসেই তুষার হয়ে গিয়ে গ্লাসে জমছে।

মুচকি হেসে বলল রানা, 'শোবার ভাল একটা জায়গা পেলে আমরা থামব।'

'শুতে পেলে নিয়াজ বউ চাইবে না তো?' রীতিমত উদ্বিগ্ন দেখাল বিনয়কে।

নিয়াজ গম্ভীর। 'রেডিওতে যদি সাড়া পাই, প্রথমেই ওদেরকে বলব রাঙা টুকটুকে একটা হেলিকপ্টার পাঠিয়ে দিক...'

অন্যান্য ইকুইপমেন্টের সাথে স্লেজে একটা রেডিফন জি-আর-থ্রী-ফোর-ফাইভ ট্র্যানসিভার এবং ডিরেকশন-ফাইন্ডার রয়েছে—পোর্টেবল হাই-ফ্রিকোয়েন্সি সেট, পনেরো ওয়াটের। কার্টিস ফিল্ড তো বটেই, ওটা দিয়ে থিউল-এর সাথেও যোগাযোগ করতে পারবে ওরা। সিকোরস্কিগুলো ওদেরকে বরফে নামিয়ে ফিরে যাবার পর তিনবার সেটটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছে

ওরা, আশা ছিল আই.আই.ফাইভের ট্র্যান্সমিশন শুনতে পাবে। কিছুই শুনতে পায়নি, আই.আই.ফাইভের যেন কোন অস্তিত্বই নেই।

যোগাযোগটুকু দরকার শুধু, ডিরেকশন-ফাইন্ডারের সাহায্যে আই.আই.ফাইভকে খুঁজে নেয়া পানির মত সহজ। কিন্তু আই.আই.ফাইভের কোন সাড়া না পাওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে রানা, তবে কাউকে কিছু টের পেতে দিল না। 'সম্ভবত স্ট্যাটিক—জানে আমরা কিছু শুনতে পাব না তাই ওরা ট্র্যান্সমিট করার চেষ্টাই করছে না।' নিয়াজের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাখ্যাটা দিল ও।

ওদের সামনে, বরফের কাছাকাছি, পাতলা হতে শুরু করেছে কুয়াশা। কিন্তু ওপর দিকে যেমন ঘন ছিল তেমনি আছে। এতক্ষণে আরও সমতল এলাকায় চলে এল ওরা। ক্যাম্প ফেলল এখানেই। পা পিছলে প্রায়ই হুমড়ি খেয়ে পড়ছে কুকুরগুলো, সহ্য ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ওগুলো। 'ফাইভ স্টার হোটেল পাওয়া বোধহয় দুরাশা,' বলল রানা। 'চিৎ হতে চাইলে এখানেই, কি...,'

হঠাৎ থেমে গেল রানা, হাতে এখনও হ্যান্ডেলবার, তাকিয়ে আছে সামনে। পাতলা হচ্ছে কুয়াশা, তার ভেতর লাল কি যেন লকলকিয়ে উঠল। এই আছে, এই নেই। চোখ পিট পিট করল ও, জানে, ভুল দেখেনি। এমনভাবে সরল কুয়াশা, কেউ যেন গুটিয়ে টেনে নিল পর্দা। সাথে সাথে লাল শিখা বিস্ফোরিত হলো আবার, ওপরের কুয়াশা ছোঁয় ছোঁয়। ধোঁয়ার একটা গন্ধ, খুবই অস্পষ্ট। কুকুরগুলোই আগে পেল, পেয়েই লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে।

'ঘটনাটা কি?' হাঁ হয়ে গেছে নিয়াজের মুখ।

জবাব না দিয়ে তার হাত থেকে কম্পাসটা একরকম কেড়ে নিল রানা। বিয়ারিং নেয়ার জন্যে ঝুঁকল ও। আবার যখন মুখ তুলল, বিপজ্জনক চেহারার শিখাটা ম্লান আভা হয়ে উঠেছে।

'কি ওটা?' আবার প্রশ্ন করল নিয়াজ। 'রানা তুমি কিছু বলছ না কেন?'

'আই.আই.ফাইভের কথা ভুলে যাও,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'থামার উপায় নেই, চলার মধ্যেই থাকতে হবে আমাদের। খুব সম্ভব আই.আই.ফাইভ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে!'

আট

'এ স্যাবোটাজ, কোন ম্যানিয়াকের কাজ!' রাগে ফুঁসে উঠল বেস লীডার ড. কর্ডন।

ওদেরকে ছুঁয়ে ভেসে যাচ্ছে কুয়াশা। পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া রেডিও-রূমটাকে শক্তিশালী ল্যাম্পের আলোয় ঘুরে ফিরে দেখছে ওরা। আগুন নিভলেও, ছাইয়ের ভেতর থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া আর পোড়া পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে—নেভেনি মনের জ্বালা।

'স্যাবোটাজ বলছেন কেন?' রাইফেলটা কাঁধে অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনারা পৌঁছেই যার সাথে আলাপ করলেন, জেমস কাজম্যান,' বলল বেস লীডার, 'সে-ই প্রথম আগুন দেখে ছুটে আসে। তার চিৎকার শুনে ছুটে আসি আমি। দেখি, দরজার খানিকটা ছাড়া ঘরের বাকি অংশ দাউ দাউ জ্বলছে। তালার

চারপাশের কাঠ ভাঙা দেখলাম...'

'তাতেই ধরে নিতে হবে স্যাবোটাজ?' বিরক্তি প্রকাশ করল রানা। 'অনেক কারণে ওটাকে ভাঙা বলে মনে হতে পারে।' দশ মিনিট আগে এখানে পৌঁছে আই.আই. ফাইভের তিন বিজ্ঞানীকে বরফের ওপর উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ও, সেই থেকেই ওদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। স্যাবোটাজ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'প্রমাণ শুধু এই একটাই নয়,' গম্ভীর সুরে বলল ড. কর্ডন। 'ঘরের ভেতর তিনটে কোলম্যান স্পেস হিটার ছিল—ওই যে, দলা পাকানো মেটাল। ঘর থেকে জেমস শেষবার বেরুবার সময় খাড়া করা ছিল ওগুলো।'

এখন উল্টে রয়েছে কিম্ভূতকিমাকার আকৃতিগুলো। 'আগুনেরও ধাক্কা আছে, তাতে উল্টে যেতে পারে,' বলল রানা।

'ফর গডস সেক, মি. মাসুদ রানা, আপনি কি আমাকে পাগল ঠাউরেছেন?' ঝাঁঝের সাথে বলল ড. কর্ডন। 'আপনিও জানেন কি রকম ভারী ওগুলো, ঝেড়ে লাথি না মারলে নড়ে না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে—শান্ত হোন,' বলে ধীর পায়ে সরে এল রানা। আই.আই.ফাইভে বছর দুয়েক আগে একবার এসেছিল ও, কিন্তু কুয়াশায় এখন আর চেনা চেনা লাগছে না। দূর থেকে আগুন জ্বলতে দেখে র‍্যাম্প না খুঁজে সরাসরি বরফের ওপর দিয়ে বেসে চলে এসেছে ওরা। র‍্যাম্পের বদলে বিশ ফিট উঁচু একটা ঢালের মাথায় চড়তে হয়েছিল, ঢাল থেকে স্লেজ টীম নিয়ে দ্বীপে নামতে অমানুষিক খাটতে হয়েছে ওদেরকে।

'কোণে ওই যে তালগোল পাকানো মেটাল দেখছেন, জ্বী,

ওটাই আমাদের ট্র্যান্সমিটার ছিল,' রানার পিছন থেকে বলল ড. কর্ডন। 'মেইনল্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করার আর কোন উপায় নেই আমাদের। প্লেন যদি আসে, তবেই আবার সভ্যতার মুখ দেখতে পাব।'

'তাও দশ দিন পর আসবে বলে শুনেছি,' বলল রানা। 'সময়টা এত পিছিয়ে ধরা হয়েছে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল ড. কর্ডন। 'আমারই দোষ। এতটা দক্ষিণে ডেপথ-সাউন্ডিং আর স্যালাইনিটি টেস্টের সুযোগ আগে আমরা পাইনি, ভাবলাম সুযোগটা হাতছাড়া করব না। কে জানত এভাবে হঠাৎ কুয়াশায় সব ঢাকা পড়ে যাবে। এখন আবার দেখুন...'

'কাকে দায়ী করেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কে আছে এখানে যে...?'

'আমরা তিনজন, কেউ হতে পারি না।' কিন্তু এক মুহূর্ত থেমে আপনমনে কাঁধ ঝাঁকাল ড. কর্ডন। 'কি জানি!' রানার দিকে তাকিয়ে অন্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করল সে, 'কে একজন রাশিয়ান আসবে, তার কি হলো? কে সে?'

'রুস্তভ, ইভেনকো রুস্তভ।' ড. কর্ডনের সিকিউরিটি ক্লিয়ার্যান্স নেই, ভোলেনি রানা। 'ভদ্রলোক সম্পর্কে বিশেষ কিছু আমার জানা নেই। ওয়াশিংটন থেকে ধারণা দেয়া হয়েছে, রুশ রাজনীতির সেট-আপ সম্পর্কে উনি নাকি পরিষ্কার কিছু বলতে পারবেন। কথা আছে এন.পি.সেভেনটিন থেকে এখানে চলে আসবেন তিনি।'

'সেজন্যেই কি আপনি এখানে?'

'আমার দায়িত্ব তাঁকে নিয়ে কার্টিস ফিল্ডে ফিরে যাওয়া। সামান্য একটা কাজ।'

হাঁ হয়ে গেল ড. কর্ডন। 'বরফের ওপর দিয়ে? সামান্য একটা কাজ? আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমি হলে, শুধু কেউ যদি অমরত্বের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আর প্রতিশ্রুতি দিত তাহলেই এই ঝুঁকি নিতে রাজি হতাম।' কাঁধ ঝাঁকাল সে, দস্তানা পরা হাত দিয়ে ভুরু থেকে বরফের গুঁড়ো ঝাড়ল সে। 'নিজের মরণ নিজে বেছে নিয়েছেন,' নিঃশব্দে হেসে রানাকে পাশ কাটাল। 'চলুন ওদের কাছে ফেরা যাক।'

'নিরিবিলিতে আলাপ করতে পারি, শুধু আমি আর আপনি?'

'রিসার্চ হাট এই তো সামনে।' অক্ষত ঘরগুলোর মাঝখান দিয়ে পথ দেখিয়ে এগোল ড. কর্ডন। তার পিছু নিয়ে আবারও মনে হলো রানার, কুয়াশা পাতলা হচ্ছে। ড. কর্ডন ভুল করেনি, রেডিও-রূমে কেউ ইচ্ছে করে আগুন দিয়েছে। কিন্তু উত্তেজনা বাড়িয়ে লাভ নেই। তাছাড়া মুখ বুজে থাকার আরও কারণ আছে। ইভেনকো রুস্তভ যদি পৌঁছুতে পারে এখানে, তাকে একা নিয়ে রওনা হবে ওরা, বিজ্ঞানীদের থেকে যেতে হবে। ড. কর্ডনের ব্যাপারে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই, লোকটাকে বেশ ক'বছর ধরে চেনে। কিন্তু জেমস কাজম্যানকে চেনে না। আর ড. রডেনবার্গকে ওর চেনার কোন দরকারই নেই। গ্র্যাভিটি স্পেশালিস্ট লোকটার দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায়, যে-কোন মুহূর্তে উন্মাদ হয়ে যেতে পারে। ইভেনকোকে নিয়ে ওরা চলে যাবার পর রাশিয়ানরা পৌঁছে চাপ দিলেও বিজ্ঞানীরা কোন তথ্য দিতে পারবে না–যদি না জানে।

'এখানে মাথা গুঁজতে হবে আপনাকে,' সারির শেষ ঘরটার তালা খুলে বলল ড. কর্ডন। 'হিটার আগে থেকেই জ্বালানো

আছে।’

বেসে পৌঁছেই হেডকোয়ার্টার রূমে ঢুকেছিল রানা, বিশ ফিট লম্বা, পনেরো ফিট চওড়া। এই ঘরটাও তাই। ঘাঁটি ত্যাগ করার প্রস্তুতি শেষ, বোঝা যায় দেয়াল ঘেঁষে থাকা কাঠের বাক্সগুলো দেখে। এক কোণে বড়সড় একটা লোহার তেপায়া দেখা গেল, মাথায় প্রকাণ্ড উইঞ্চ মেকানিজম। তেপায়াটা দেখিয়ে ড. কর্ডন বলল, ‘সী-বেডে নামাবার জন্যে আন্ডারওয়াটার ক্যামেরা ওটায় বাঁধা হয়। একটাই গর্তের ভেতর ড্রিলিং কোর-ও নামাই আমরা। দেখার শখ আছে?’

প্রশ্নই ওঠে না। রানা কি বিজ্ঞানী? কিন্তু দেখাতে যখন চাইছে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। ঝুঁকে পড়ে তেপায়ার নিচ থেকে কাঠের মেঝে খানিকটা সরাল ড. কর্ডন। চার ফুটি একটা চৌকো ট্র্যাপ-ডোর। ছ’ফিট নিচে আরেক প্রস্থ মেঝে দেখা গেল। ‘দেখুন, জায়গাটা আপনার পছন্দ হয় কিনা। ইমার্জেন্সি দেখা দিলে কমরেড মহাশয়কে ওখানে আমরা লুকিয়ে রাখতে পারি।’ একটু গম্ভীর হলো সে। ‘স্বীকার করি, খুব ঠাণ্ডা লাগবে তাঁর, কিন্তু এর বেশি কিছু করা...’

হঠাৎ হেসে ফেলল রানা। ‘আসলে কি বলতে চান?’ কি ঘটেছে তা যেন আন্দাজ করতে পারছে ও।

ড. কর্ডন কিন্তু গম্ভীর হয়েই থাকল। ‘জেনারেল ফচ চিঠিতে যা লিখেছেন, আপনিও ঠিক তাই বলছেন, কিন্তু আমার নিজেরও তো কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে? কুয়াশার ভেতর দিয়ে পথ হাতড়ে এসেছেন আপনারা, প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে। তারমানেই ইভেনকো রুস্তভ বেড়াতে আসছেন না, পালিয়ে আসছেন। তাঁকে

রিসিভ করার জন্যে এই আয়োজন দেখেই তো বোঝা যায়, সোনা বা হীরের চেয়েও দামী কোন খনি হবেন তিনি। অর্থাৎ তাঁর পিছু পিছু নির্ঘাত রুশ সিকিউরিটিও আসবে। ঠিক কিনা?'

'হ্যাঁ, আপনাকে তো আমি বলেইছি...'

'কিন্তু এই একই কারণে আমার রেডিও-রূম স্যাবোটাজ করা হয়েছে তা বলেননি! কাজটা ওরা ইচ্ছে করে করেছে, ওরা এসে পৌঁছুলে আমরা যাতে কার্টিস ফিল্ডের সাথে যোগাযোগ করতে না পারি।'

'দ্বিতীয় মেঝের নিচে কি আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ভাল কথা, গুন্টার রডেনবার্গ আর জেমস কাজম্যান যেন সব কথা না জানে।'

আবার ঝুঁকল ড. কর্ডন, হুকের সাথে আটকানো একটা রশি ধরে টান দিল। নিচের মেঝে থেকেও চৌকো একটা তক্তা, ট্র্যাপডোর, সরে গেল। ভেতরে অন্ধকার। ল্যাম্পের সুইচ অন করে আলো ফেলল সে। দ্বিতীয় ট্র্যাপ-ডোরের অনেক নিচে পর্যন্ত আলো গেল, কিন্তু তবু কিছু দেখা গেল না–শ্যাফট্টা আরও অনেক গভীর। কটু একটা গন্ধ পেল রানা। শ্যাফটের দেয়ালে বরফ জমে রয়েছে।

'আরও নিচে বরফ, তারপর আর্কটিক সাগর,' বলল ড. কর্ডন। 'লাশ লুকাবার জন্যে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর পাবেন?'

'আপনার বুঝি ধারণা, দরকার হলে ইভেনকোকে মেরে ফেলব আমরা, তবু রাশিয়ানদের জানতে দেব না তাকে আমরা ভাগিয়ে এনেছি?'

হেসে ফেলল ড. কর্ডন। 'স্রেফ একটা জোক, মি. মাসুদ

রানা। তাও টেনশন থেকে রিলিজ পাবার জন্যে। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, মেজাজ চড়ে আছে আমার? কারণটা বুঝতে পারবেন, যখন দেখবেন পাশের ঘরে বসে চুরুট ফুঁকছেন আপনার ইভেনকো রুস্তভ।'

রুশ ফেরারী, সোভিয়েত ইউনিয়নের চীফ ওশেনোগ্রাফার, মেরিলিন সিস্টেমের ডিজাইনার এবং স্রষ্টা, ইভেনকো রুস্তভ ঘরের দেয়ালে লাগানো বাংকে শুয়ে বিচ্ছিরি শব্দে নাক ডাকছেন। বেরিয়ে আছে শুধু মুখটা, পা থেকে গলা পর্যন্ত কম্বলে মোড়া। ঘরে ধোঁয়া, চুরুটের গন্ধ, চুরুটটা পড়ে রয়েছে মেঝেতে—নিভে গেছে। ঘুমের মধ্যে খক খক করে কাশছেন তিনি, ঘুমন্ত চেহারায় অশান্তি আর উদ্বেগের ছাপ।

'আপনারা আসার আধ ঘণ্টা আগে পৌঁচেছেন,' ব্যাখ্যা করল ড. কর্ডন। 'রেডিও-রূম পুড়ছে, পাশে একা দাঁড়িয়ে আছি আমি, টলতে টলতে কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন কমরেড। এই ঘরটাই কাছে, তাড়াতাড়ি নিয়ে চলে এলাম।'

এক অর্থে বিপরীতে হিত হয়েছে, ভাবল রানা। রাশিয়ানরা রেডিও-রূমে আগুন ধরিয়েছিল বলেই পথ চিনে আই.আই.ফাইভে আসতে পেরেছেন ইভেনকো। ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কি যেন বলছেন তিনি, তার মুখের কাছে কান নামাল রানা।

'সুমাইয়া...।' স্বপ্নে বোধহয় প্রেমিকাকে দেখতে পাচ্ছেন ভদ্রলোক।

'কেমন বুঝছেন ওঁর অবস্থা?' ফিসফিস করে জানতে চাইল রানা। 'এক সময় তো মেডিসিন নিয়ে চর্চা করেছেন।'

‘ফ্রস্টবাইট ততটা মারাত্মক নয়। ওষুধ দিয়েছি। কিন্তু প্রলাপ থামানো যাচ্ছিল না।’

‘ঠোঁট পুড়ল কিভাবে?’

‘চুরুটটা আমিই ধরিয়ে দিই, কিন্তু উল্টো করে ধরে মুখে পুরলেন,’ বিষণ্ন দেখাল ড. কর্ডনকে। ‘ভয় পাবার কিছু নেই, ঘুম ভাঙার পর আপনার চেহারা দেখলেই আবার উনি স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন।’

ভুরু কুঁচকে তাকাল রানা।

‘বললাম না, প্রলাপ থামানো যাচ্ছিল না?’ হাসতে লাগল ড. কর্ডন। ‘পরিষ্কার ইংরেজিতে বারবার একই কথা বলছিলেন–দ্য হিরো, দ্য গ্রেটেস্ট স্পাই অভ দ্য সেঞ্চুরি, হয়্যার ইজ হি? তারপর বললেন, তাকে যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার সামনে হাজির করতে না পারো, আমি ফিরে যাব, সুইসাইড করব। কাজেই বাধ্য হয়ে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিলাম। এমন ভাবে কথা বলছিলেন, তিনি আসবেন আমি যেন জানি।’

‘এলেন কিভাবে?’

‘সম্ভবত স্লেজে চড়ে...’

‘সোজা করে কথা বলুন। সম্ভবত আবার কি?’

‘এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ নয় যে...’

‘নয়? স্লেজটা যদি কুয়াশার ভেতর কোথাও পড়ে থাকে আর রাশিয়ানরা দেখতে পায়, তাহলে...?’

হাত তুলে আত্মসমর্পণ করল ড. কর্ডন। ‘দুঃখিত। বললেন, এখানেই কাছাকাছি কোথাও কুকুরগুলোকে হারিয়ে ফেলেন তিনি। অগত্যা নিজেই স্লেজটাকে টেনে নিয়ে আসছিলেন, অসুস্থ হয়ে

পড়ার সেটাও একটা কারণ। তারপর আগুন দেখে কম্পাস বের করেন, বেয়ারিং নিয়ে হেঁটে চলে আসেন এখানে—স্লেজটাকে ফেলেই।' রানার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল ড. কর্ডন, খস্ করে দিয়াশলাই জ্বালার আওয়াজে নড়ে উঠলেন ইভেনকো রুস্তভ। 'আমার ধারণা, ক্লিফের ওদিকে আধ মাইল দূরে স্লেজ পড়ে আছে। ভয়ের ব্যাপার?'

'খুব একটা নয়। কি করে বুঝলেন উনিই ইভেনকো রুস্তভ?'

'উনিই বললেন...'

'এটা কি ওঁর জ্যাকেট?' বলে টেবিল থেকে জ্যাকেটটা তুলে পকেটগুলো হাতড়াতে শুরু করল রানা। 'যতদূর মনে পড়ে, গতবার এখানে এসে এই ঘরে বাংকটা আমি দেখিনি।'

'দেখেননি,' বলল কর্ডন। 'বলতে পারেন, আজ আমার ভূমিকায় অভিনয় করছেন ইভেনকো। সবার কাছ থেকে পালিয়ে একা কিছু ভাবতে হলে এখানে চলে আসি আমি। বাংকটা তৈরি করে নিয়েছি, দরকার হলে ঘুমিয়েও নিতে পারি।'

'আসলে রডেনবার্গের কাছ থেকে পালিয়ে আসার দরকার হয় আপনার, তাই না?' মানিব্যাগটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে রানা। জিনিসগুলো বের করে টেবিলের ওপর রাখছে।

'গুণী লোকের বুদ্ধির প্রশংসা করতে নেই, তাতে নাকি তাকে অপমানই করা হয়,' হাসতে হাসতে বলল ড. কর্ডন। 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন—প্রায় উন্মাদই হয়ে গেছে রডেনবার্গ। কাজম্যানও হচ্ছে, একটু একটু করে। আতঙ্ক জিনিসটা সংক্রামক কিনা। ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র এত খুঁটিয়ে দেখার দরকার আছে কি?' গলার সুরে একটু যেন অসন্তোষ।

'আছে। যেমন এই কার্ডটা বলছে উনি ইভেনকো রুস্তভ। মুশকিল হলো, ভদ্রলোকের কোন ছবি আমরা পাইনি আগে। সিকিউরিটি পিছু নিয়েছে, এ-ধরনের কিছু বলেছেন উনি?'

মাথা নাড়ল ড. কর্ডন। 'আমি জানি না উনি আসছেন, এটা টের পেয়েই বোধহয় আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেন। ইঞ্জেকশন দিতে একটু জোর খাটাতে হয়েছে।'

ইভেনকোর ভিজে পারকাটা তুলে নিল রানা। স্পেস হিটারের কাছে ছিল ওটা, বরফ গলে গেছে।

'উনি যে এসেছেন আর কেউ তা জানে না,' বলল ড. কর্ডন। 'আমি চাইনি আতঙ্ক আরও বাড়ুক। তাছাড়া, রুশ সিকিউরিটি এলে রডেনবার্গ মুখ বুজে থাকবে বলে বিশ্বাস হয় না।'

'আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়-থুড়ি!'

দু'জনেই হাসল, নড়ে উঠলেন ইভেনকো।

'রাশিয়ানরা যদি এসেই পড়ে,' বলল রানা, 'আপনার ওই গর্তেই ভদ্রলোককে রাখতে হবে।'

'জ্যান্ত মানুষকে?' প্রতিবাদ জানাল ড. কর্ডন। 'বললাম না, জোক করেছি? ওখানে ওঁকে রাখলে স্রেফ আধ ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবেন...'

'ফার দিয়ে মুড়ে রাখলেও, আর পাশে যদি একটা হিটার ঝুলিয়ে রাখি? কিছুক্ষণের জন্যে, সার্চ করে রাশিয়ানরা চলে গেলে আবার তুলে আনব।'

চাপা গলায় গর্জে উঠল ড. কর্ডন। 'আমেরিকান বেস সার্চ করবে রুশ সিকিউরিটি?'

'নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে প্রস্তাবটা আমরাও দিতে পারি,'

বলল রানা। ইভেনকোর পারকার পকেট থেকে লম্বা একটা টিউব বের করল ও। বেশ ভারী, লম্বায় এক ফুট। ‘বিপদের গুরুত্বটা শুধু আপনাকেই বলছি। আই.আই.ফাইভে আটকা পড়ে গেছি আমরা। কোন প্লেন আসছে না। রেডিও-ও নেই। আমরা এখানে যারা আছি হঠাৎ এই মুহূর্তে বাতাসে মিলিয়ে গেলে কেউ কোন দিন প্রমাণ করতে পারবে না আসলে কি ঘটেছিল।’

ধীরে ধীরে কাঠের একটা চেয়ারে বসল ড. কর্ডন, বোবা দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। ‘কে এখন আতঙ্ক ছড়াচ্ছে?’ জোর করে হাসল সে। ‘আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না...ওদের এত বড় সাহস হবে...?’

‘পরিষ্কার জেনে রাখুন,’ ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা, ‘খুব বেশি সাহসের দরকার নেই, দরকার শুধু খানিকটা নিষ্ঠুরতার। ধরুন, আপনাদের একটা স্নো-ক্যাট এখান থেকে খানিক দূরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল—ফুয়েল শেষ হয়ে গেছে। কুয়াশা সরে যাবার পর কার্টিস ফিল্ড থেকে উড়ে এসে কি দেখবে ওরা? বেস খালি, রেডিও-রূম ছাই, স্নো-ক্যাট পরিত্যক্ত। কি বুঝবে?’

‘কুয়াশা আসছে দেখে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি, রেডিও-রূমে আগুন ধরে যাওয়ায় স্নো-ক্যাট নিয়ে বেরিয়ে পড়ি...’

‘ফুয়েল ফুরিয়ে যায়,’ বলল রানা। ‘কাজেই আপনারা বেসে ফেরার জন্যে হাঁটা ধরেন। এবং...’

‘ফেরার পথে কোন ফাটলে পড়ে...’

‘কিংবা কোন মুভিং প্রেশার রিজ আপনাদের গিলে নেয়।’

‘কিন্তু সেটা হবে পাইকারী হত্যাকাণ্ড!’ প্রতিবাদ জানাল ড. কর্ডন। ‘রাশিয়ানরা...’

‘যোগফলটা কি হতে পারে তাই শুধু কল্পনায় রাখতে বললাম,’ বলল রানা। ‘কি ঘটবে সেটা পরের কথা। কারা আসছে সেটা ভুলে যাবেন না। কে.জি.বি. হলে তবু কথা ছিল, কিন্তু এ যে বলটুর পোষা কুকুর—এস.এস.এস.।’

‘আমরা যাচ্ছি কখন?’

হেডকোয়ার্টার বিল্ডিঙের উল্টোদিকের একটা ঘরে কুকুরগুলোকে বেঁধে রাখছে নিয়াজ। ঘরের তিন দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটার ওপর একটা কাঠের বাক্স, সবগুলোয় জিনিস-পত্র ভরে তালা মেরে দেয়া হয়েছে। বেস ত্যাগ করার প্রস্তুতি প্রায় শেষ, বেশিরভাগ ঘর খালি পড়ে আছে। অথচ ওদেরকে নিতে প্লেন আসবে দশ দিন পর।

‘ইভেনকো আগে সুস্থ হোন,’ বলল রানা। ‘ইমার্জেন্সি দেখা দিলে আলাদা কথা।’

স্পেস হিটারটা অ্যাডজাস্ট করছে নিয়াজ, মুখ তুলে তাকাল। ‘ইমার্জেন্সি মানে? স্পেশাল সিকিউরিটি?’

‘এরই মধ্যে একবার এসে গেছে ওরা। বোধহয় ফিরেও যায়নি, কাছে পিঠে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে।’ এক সেকেন্ড ভাবল রানা। ‘এখানের কাজ শেষ করে আমাদের ট্র্যান্সমিটারটা বের করো। কার্টিস ফিল্ডে একটা মেসেজ পাঠানো দরকার। ওদের বলো, আই.আই. ফাইভের রেডিও নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। স্যাবোটাজ—শব্দটা কয়েকবার রিপিট করবে। আর কিছু না। সাথে সাথে প্যাক করে রেখে দেবে ট্র্যান্সমিটার।’

‘মেসেজ রিসিভ করল কিনা শুনবও না?’

‘মেসেজটা কার্টিস ফিল্ডের জন্যে নয়,’ বলল রানা। ‘এন.পি.সেভেনটিনের মনিটরিং সেটে রাশিয়ানরা রিসিভ করবে ওটা।’

‘রহস্যময়। জানতে পারি...?’

‘পরে। কাজটা শেষ করে ঘরটা পাহারা দিতে চাও, বিনয়কে সাথে রাখো।’ কোন্ ঘরটা তা উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করল না। ‘বিপদ দেখলে, রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করবে। পালা করে পাহারা দেবে তোমরা, একজন ঘুমাবে।’

‘ঘুম শুধু বুঝি আমাদেরই দরকার?’

জবাব না দিয়ে ঘর থেকে হিম রাতে বেরিয়ে এল রানা, দরজা বন্ধ করার সময় শক্ত হয়ে উঠল মুখের চেহারা। দু’সারি ঘরের মাঝখানে প্রায় সমতল বরফ-পথ, মাত্র ছ’ফিট চওড়া। কুয়াশা আবার ঘন হয়ে গেছে, প্রতি মুহূর্তে গাঢ় হচ্ছে আরও। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল ও। কাছাকাছি কোথাও থেকে জেনারেটরের মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে। দূর থেকে আরও একটা শব্দ আসছে, দ্বীপটাকে ঘিরে পোলার প্যাকের আস্ফালন।

বরফ-রাজ্যের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত যখন দ্বীপটা ভাঙবে, কলমা পড়ার সময়ও পাওয়া যাবে না। পলকের মধ্যে লম্বা লম্বা চিড় ধরবে বরফে, নিমেষে সেগুলো চওড়া ফাটলে পরিণত হবে। অথবা, এমনও হতে পারে, মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যে গোটা দ্বীপ বিস্ফোরিত হবে, বরফের কণা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে আকাশে।

দ্বীপের নিরাপত্তা নয়, এই মুহূর্তে রানার উদ্বেগ: কুয়াশার ভেতর কি নড়াচড়া করছে। পাহাড়টা দেখা যায় না, কিন্তু আছে, সেদিকে তাকাল রানা। চল্লিশ ফিট উঁচু, গায়ে বড় বড় বোল্ডার।

সবচেয়ে কাছের উপকূল থেকে একশো মাইল দূরে সাগরে ভাসছে। ঠাণ্ডায় হি হি করছে রানা, ব্যথা করছে চোখ। নিয়াজ মিথ্যে বলেনি, ওর-ও ঘুম দরকার। পথটুকু পেরিয়ে হেডকোয়ার্টার হাটের দরজায় নক করল ও। পারকা পরে বেরিয়ে এল বিনয়।

ইভেনকোর উপস্থিতি সম্পর্কে স্রেফ শুনে গেল বিনয়, কোন মন্তব্য করল না। হাতের রাইফেল কাঁধে ঝোলাবার সময় শুধু বলল, 'রডেনবার্গ আত্মহত্যা করলে খুশি হতাম। একটা আপদ।'

হেডকোয়ার্টারের ভেতর ঢুকেই থমকে দাঁড়াল রানা। ড. কর্ডনের সাথে মারমুখো হয়ে ঝগড়া করছে রডেনবার্গ। 'রেডিও নেই, প্লেন আসছে না, দ্বীপটা ভাঙছে–অর্থাৎ আমরা মারা যাচ্ছি। কেন তাহলে এখানে অপেক্ষা করব আমরা? প্রাণের ওপর তোমার মায়া না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। কেউ যদি না যায়, আমি একাই বেরিয়ে পড়ব...'

নিচের একটা বাংকে শুয়ে রয়েছে জেমস্ কাজম্যান, রডেনবার্গের দিকে তাকিয়ে দিয়াশলাইয়ের কাঠি চিবাচ্ছে। বুকে হাত বেঁধে একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ড. কর্ডন।

থোঃ করে থুথু ফেলে ধমকে উঠল কাজম্যান, 'ঈশ্বরের দোহাই, একটু ঘুমাও রডেনবার্গ।' রডেনবার্গের পিছন থেকে তার একটা হাত ধরে বাংকের দিকে টানল অয়্যারলেস অপারেটর। 'অন্তত এই ভদ্রলোকের সম্মানে ঝগড়া ঝাঁটি...'

ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে প্রায় ছুটে রানার সামনে এসে দাঁড়াল রডেনবার্গ, চিৎকার করে জানতে চাইল, 'এই যে ভদ্দরলোক, আপনারা এখানে কি মনে করে এসেছেন, জানতে পারি?'

‘আগেই তো বলেছি,’ শান্ত সুরে জবাব দিল রানা। ‘আমাদের হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করায়…’

‘মিথ্যে কথা! আমি বিশ্বাস করি না!’

এক পাশে সরে রাইফেলটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল রানা। তারপর পারকা খুলে টেবিলের ওপর রেখে বলল, ‘তুমি মদ খেয়েছ, তাই না?’ গন্ধটা ঘরে ঢুকেই পেয়েছে ও।

‘ঈশ্বর জানেন কোথায় লুকিয়ে রেখেছে বোতলটা,’ বলল ড. কর্ডন। ‘কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি…’

‘কোথায় আবার, যেখানে ও হাত লাগাতে দেবে না,’ বলল রানা। ‘ওর গায়ে।’

হঠাৎ টেবিলের তলা থেকে একটা শাবল তুলে মাথার ওপর উঁচু করল রডেনবার্গ। ‘কেউ আমাকে সার্চ করতে এলে আমি তার…’

‘নামাও ওটা!’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আদেশ করল ড. কর্ডন।

‘শালার ভেতো বাঙালী আমার ওপর মাতব্বরী ফলাতে চায়!’ হিস হিস করে উঠল রডেনবার্গ। ‘দেখো না কেমন হলুদ মগজ বের করে দিই…’

সাবধান করে দিল রানা, ‘জেমস, নড়বে না। ওর যা খুশি করতে দাও।’ পারকাটা তুলে নিল টেবিল থেকে। ‘আমি কোন গোলমাল চাই না, ড. কর্ডন। অন্য কোন ঘরে থাকব আমি।’ পারকাটা পরতে শুরু করল ও। ঠিক এই সময় ওর মাথা লক্ষ্য করে শাবলটা নামিয়ে আনল রডেনবার্গ।

একপাশে সরে গিয়ে পারকা দিয়ে রডেনবার্গের মুখ আর মাথা ঢেকে দিল রানা। শাবলটা রানার মাথায় না লাগায় তাল হারিয়ে

পড়ে যাচ্ছিল রডেনবার্গ, তাকে ধরে সিধে করল রানা। তারপর ডানহাতে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল তার পেটে। কোঁক করে আওয়াজ হলো, বসে পড়ল রডেনবার্গ। তার মাথা থেকে পারকা খুলে নিল রানা। গ্র্যাভিটি স্পেশালিস্ট শুয়ে পড়ল, জ্ঞান হারিয়েছে।

কেউ কোন কথা বলল না। এগিয়ে এসে রডেনবার্গকে সার্চ করল ড. কর্ডন। সত্যিই পারকার ভেতরের পকেট থেকে মদের একটা প্রায়-খালি বোতল বেরুল। তার পালস পরীক্ষা করল সে। 'প্রচুর গিলেছে, ঘণ্টা কয়েকের আগে জ্ঞান ফিরবে বলে মনে হয় না।'

'অন্য কোন ঘরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব?'

'পাশের ঘরে দুটো বাংক আছে...'

'ওখানেই তাহলে,' বলল রানা। 'বেঁধে রাখবেন।'

চোখে অস্বস্তি নিয়ে তাকাল ড. কর্ডন। 'বেঁধে?'

'বেঁধে।' শাবলটা মেঝে থেকে তুলল রানা। 'যে লোক কোন কারণ ছাড়াই এটা দিয়ে মারতে আসে, তাকে না বেঁধে উপায় কি? ঘরটায় বাইরে থেকে তালাও লাগাতে হবে।' বাংক থেকে নেমে এগিয়ে এল কাজম্যান, অচেতন রডেনবার্গকে কাঁধে তুলতে শুরু করল। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে গেল ড. কর্ডন, তাকে বাধা দিল রানা, 'তালা লাগাতে বলছি, কারণ আছে।' এগিয়ে গিয়ে লম্বা কাবার্ডের সামনে দাঁড়াল ও। হাত উঁচু করে কাবার্ডের মাথা থেকে মদের আরও একটা বোতল নামাল। 'আমি আপনার চেয়ে লম্বা, তাই ঘরে ঢুকেই এটা দেখেছিলাম। দু'একটা বোতল আরও কোথাও থাকতে পারে।'

রানার হাত থেকে বোতলটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল ড.

কর্ডন। 'আশ্চর্য! এগুলো পেল কোথায়!' লেবেলেই লেখা রয়েছে, রাশিয়ান ভদকা। 'ড. সোরভের কাছ থেকে পেতে পারে না, তিনি হার্মলেস–এন.পি.সেভেনটিনের চার্জে আছেন ভদ্রলোক। আমরা কেমন আছি দেখার জন্যে মাঝে মধ্যে আসেন এখানে...'

'আসেন তথ্য সংগ্রহের জন্যে,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'ভদকার বিনিময়ে। রডেনবার্গকে সাধু মনে করার কোন কারণ নেই। এবার নিশ্চয়ই ওর ঘরে তালা লাগাতে আপত্তি করবেন না, ড. কর্ডন?'

'মেসেজটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে,' জেনারেল ফচ পায়চারি করতে করতে বললেন, 'সংকট দানা বাঁধছে, টমাস। কাজেই আই.আই. ফাইভে আমি একটা প্লেন পাঠাচ্ছি।'

'কিন্তু কুয়াশা এখনও সরেনি,' প্রতিবাদ জানাল টমাস। 'পাইলট ল্যান্ড করবে কিভাবে?'

'পাঁচবার স্যাবোটাজ শব্দটা ব্যবহার করেছে ওরা,' কটমট করে সহকারীর দিকে তাকালেন জেনারেল। 'রেডিও-রূম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।' খোসা ছাড়ানো রসুনের কোয়া না গিলে চিবাতে শুরু করলেন তিনি। 'প্লেন তৈরি হয়ে আছে, বললেই টেক-অফ করবে। ম্যাট ইসটনকে পাঠাচ্ছি আমি।'

'কিন্তু ল্যান্ড করবে কিভাবে?'

'জানি না। শুধু জানি, কেউ যদি ল্যান্ড করতে পারে তো সে ইসটন। আর্কটিকের বিভিন্ন এলাকায় আই.আই.ফাইভে পাঁচবার ল্যান্ড করেছে সে। হাজার মাইলের মধ্যে তার চেয়ে দক্ষ সিভিলিয়ান পাইলট আর নেই। আমার নির্দেশ জানিয়ে দাও

তাকে।’

‘আমার একদম পছন্দ হচ্ছে না,’ বলে ফোনের রিসিভার তুলে নিল টমাস। এয়ারফিল্ড কন্ট্রোলারের সাথে কথা বলবে।

‘ইসটনেরও হবে না,’ গম্ভীর সুরে বললেন জেনারেল ফচ।

‘মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি,’ ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে করতে বলল নিয়াজ। চারদিকে তাকাল সে। ‘কোথায় সবাই?’

‘রডেনবার্গকে শোয়াতে গেছে।’ কি ঘটেছে সব নিয়াজকে শোনাল রানা। ‘কেউ বোধহয় ধরতে পারেনি, আমাকে যাতে মারতে আসে সেজন্যে ইচ্ছে করেই খোঁচাই ওকে। বিপদের সময় উটকো ঝামেলা চাই না।’

‘তুমি ভাবছ রাশিয়ানরা আসবে?’ টেবিলের ওপর রানার পারকার ওপর নিজেরটা রাখল নিয়াজ। ‘বাইরে শালার বজ্জাতটা বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে মনে হলো।’ ঠাণ্ডাকে গাল পাড়ল সে। ‘খানিকপরই বিনয়কে রেহাই দিতে যাব।’

‘ভাবছি না, জানি,’ বলল রানা। ‘প্রশ্ন হলো আমরা চলে যাবার আগে না পরে আসবে? যদি আগে হয়, সব ফাঁস করে দেয়ার জন্যে দুর্বল একটা বোন থাকুক, চাই না।’ ইঙ্গিতে ভদকার বোতল দুটো দেখাল ও। ‘মদের বিনিময়ে আগে থেকেই তথ্য পাচার করে আসছে সে। রেডিও-রুমের কথা তার কাছ থেকেই জেনেছে ওরা।’

‘রেডিও-রুমের কথা কারও কাছ থেকে জানতে হবে কেন? আকাশ-ছোঁয়া মাস্ট থাকতে?’

ফ্লাস্ক থেকে দুটো কাপে কফি ঢালল রানা। ‘রেডিও-রুমে কেউ শোয় না, এই তথ্য? কোন কোন বেসের রেডিও-রুমে

অপারেটরের জন্যে একটা বাংক থাকে, এখানে তার দরকার হয়নি। শুধু ট্র্যান্সমিটার ব্যবহার করবার দরকার পড়লে ওখানে যেত জেমস।' রানার হাত থেকে ধূমায়িত কফির কাপটা নিল নিয়াজ। টেবিলের ওপর পাশাপাশি লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা টিউব জোড়া নিয়াজকে দেখাল রানা। 'চিনতে পারো?'

'ওগুলোর একেকটার ভেতর পঁচিশ হাজার বছরের ইতিহাস পোরা আছে।' একটা টিউব তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখাল নিয়াজ। 'ভাবতে আশ্চর্যই লাগে, ড্রিলের শেষ মাথায় আটকে দিয়ে এগুলোর ফাঁপা একটা দশ হাজার ফিট নিচে সাগরের তলায় নামিয়ে দেয়া হয়, উঠে আসে সী-কোর নমুনা নিয়ে। হাজার হাজার বছর ধরে মহাসাগরের ভীষণ চাপে জিয়োলজিক্যাল স্তর তৈরি হয়েছে। পঁচিশ হাজার বছর ধরে, অথচ তোমার পকেটে ভরে রাখতে পারো।'

'কৃতিত্বটা ইভেনকো রুস্তভের। দুটোর মধ্যে তফাৎটা কি ধরতে পারো?'

দ্বিতীয় টিউবটাও পরীক্ষা করল নিয়াজ। দুটোর গায়েই মরচে ধরেছে। কোনটাই ফাঁপা নয়, ভেতরে কোর রয়েছে। 'শুধুই অতল তল থেকে তুলে আনা শাঁস,' একটা বাক্সের ওপর ড. কর্ডনের সাজানো টিউবগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল সে, 'ওগুলোয় যা আছে, তাই।'

'দুটোর মধ্যে একটা ইভেনকোর,' নিয়াজের হাত থেকে দ্বিতীয় টিউবটা নিয়ে বলল রানা। টিউবের একটা প্রান্ত পেন-নাইফ দিয়ে খোঁচাতে শুরু করল। তিন ইঞ্চি লম্বা নিরেট একটা কোরের টুকরো পড়ল তালুতে। টিউবটা ঝাঁকাতে শুরু করল ও, অপরপ্রান্তের কোর

তাতে পড়ল না, যেমন ছিল তেমনি থাকল। কিছুক্ষণ ঝাঁকাবার পর হঠাৎ করেই রানার তালুতে চকচকে এবং শক্ত করে গোল পাকানো কি যেন পড়ল আবার। উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার মুখ। জিনিসটা নিয়াজের চোখের সামনে, আলোর কাছাকাছি ধরল ও। থারটি-ফাইভ মিলিমিটার ফিল্মের একটা অংশ। 'যদি ভুল না হয়, আমার হাতে মেরিলিন চার্টের মাইক্রোফিল্ম দেখছ তুমি, নিয়াজ।'

'হরিবল!'

'আর্কটিকে রাশিয়ানদের গোটা আন্ডারওয়াটার সিস্টেমের রেকর্ড, নিয়াজ।' ফিল্মটা আবার গুটিয়ে নিল রানা। টিউবের ভেতর ঢুকিয়ে রেখে কোর দিয়ে বন্ধ করে দিল মুখ। 'যদিও,' গলা খাদে নামিয়ে বলল ও, 'এটা নকল বলেই আমার ধারণা। রাশিয়ানরা জানে মেরিলিন চার্ট নিয়ে পালিয়ে আসবে ইভেনকো, নিশ্চয়ই আসলটা নিয়ে আসতে দেয়নি।'

'কিন্তু আমেরিকান বন্ধুরা এ-সব কথা জানে না,' বলল নিয়াজ। 'এটাকেই তারা আসল বলে ধরে নেবে। কাজেই জিনিসটা আমাদের কাছে লুকানো থাকাই ভাল।'

'কে.জি.বি-র ওপর খুব একটা আস্থা আমার নেই,' অন্যমনস্ক দেখাল রানাকে। 'ধরো, ইভেনকো নিজের ইচ্ছায় এসেছেন। সেক্ষেত্রে কে.জি.বি. বা স্পেশাল সিকিউরিটি নকল মেরিলিন চার্ট চুরি করতে দেবে ইভেনকোকে। কিন্তু যদি এমন হয়, সে ব্যবস্থা কোন কারণে করা হয়নি? যদি এমন হয়, আসল চার্টই আনতে পেরেছেন ইভেনকো?'

'রানা, তুমি কি ওটা এখুনি নষ্ট করে ফেলতে চাইছ?'

'দূর বোকা!' হাসল রানা। 'নষ্ট করা মানে নিজেদের বিপদ

ডেকে আনা। আমেরিকানদের বুঝ দেব কি দিয়ে?’ গলা আরও খাদে নামাল রানা, ‘পাহারায় থাকছি আমি। ক্যামেরাটা কোথায় রেখেছ?’

‘পারকার পকেটে।’

‘তাড়াতাড়ি সারবে,’ বলে দরজার দিকে এগোল রানা। ‘একটা কপি আমাদের কাছেও থাকুক। কেউ আসছে দেখলে নক করব।’ কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রানা,তার আগেই কাজে হাত দিয়েছে নিয়াজ।

কাজটা মাত্র শেষ করেছে নিয়াজ, বিস্ফোরিত হলো দরজা। ঘরে ঢুকল বিনয়। ‘রাশিয়ানরা পৌঁছে গেছে! ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনেছি আমি!’

নয়

এন.পি.সেভেনটিন থেকে রওনা হয়ে কুয়াশার কিনারায় ল্যান্ড করল হেলিকপ্টার। একটা স্নো-ক্যাট অপেক্ষা করছিল, তাতে চড়ে বসল কর্নেল বলটুয়েভ। স্নো-ক্যাটের ট্র্যাকগুলো দেখতে অদ্ভুত, আর্কটিকে অল্প দূরত্ব পেরোবার কাজে ব্যবহার করা হয়। চারটে ক্যাটারপিলার ট্র্যাক, সামনের দুটোর ওপর বসানো আছে ড্রাইভারের ক্যাব। বাকি দুটো ট্র্যাকের পিছনের অংশের ভার বহন করছে।

‘একটার দিকে আই.আই.ফাইভে পৌঁছুব আমরা, কমরেড

কর্নেল,' বলটুয়েভের পাশের সীটে বসতে বসতে বলল জুনায়েভ। তার ঘাড়েই স্নো-ক্যাট চালাবার দায়িত্ব চাপানো হয়েছে।

'আমাদের হিসেব বলে প্রায় ওই একই সময়ে ইভেনকো বেঈমানটাও পৌঁছুবে ওখানে।'

কুয়াশা সত্ত্বেও আই.আই.ফাইভকে খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধে হলো না। সিকিউরিটি ডিটাচমেন্ট আগেই রওনা হয়ে গেছে। আই.আই.ফাইভের পিছনে, পাথুরে পাহাড়ের মাথায় একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস রোপণ করে রেখেছে তারা, ডিভাইসের অপর অংশটা রয়েছে জুনায়েভের সামনে। সেটার ওপর চোখ রেখে সোজা স্নো-ক্যাট চালাচ্ছে সে। পথ ভুল করার কোন উপায় নেই, সোজা আই.আই.ফাইভে পৌঁছে যাবে দলটা। অসুবিধে শুধু একটাই, হৃদয়হীন ঠাণ্ডা। জুনায়েভ তো কাঁপছেই, পিছনে বসা লোক দশজনও হি হি করছে। কিন্তু ঠাণ্ডাকে যার সবচেয়ে ভয়, ঘরের ভেতর সব সময় যে হিটার বা স্টোভ জ্বেলে রাখে, সেই কর্নেল বলটুয়েভ সবাইকে একেবারে তাজ্জব বানিয়ে দিল। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে সে। ভাবটা, দেখো, ঠাণ্ডা আমাকে এতটুকু কাবু করতে পারেনি। ঠাণ্ডা তাকে কাবু করতে পারছে না, এর চেয়ে বিস্ময়কর বলে মনে হলো তার হাসি। জুনায়েভের অভিজ্ঞতা বলে, সাপের পা সে দেখে থাকলেও দেখতে পারে, কিন্তু কর্নেলের হাসি দেখছে এই প্রথম।

আরও আশ্চর্য, প্রায় প্রতি মুহূর্তে হাসিটা ছড়িয়ে পড়ছে সারা মুখে। কর্নেল নিজে স্বীকার না করলে কারও বোঝারও উপায় নেই যে সে আসলে ঠাণ্ডার থাবা থেকে বাঁচার জন্যে এই কৌশলটা বেছে নিয়েছে। বেদম হাসলে গা গরম থাকে, কোথায় যেন শুনেছে

সে। এক ঢিলে দুটো পাখি মারছে কর্নেল। গা তো গরম রাখছেই, সেই সাথে চোখে আঙুল দিয়ে জুনায়েভকে দেখিয়ে দিচ্ছে—শীত আমার কাছে নস্যি।

স্নো-র‍্যাম্পটাকে এড়িয়ে গেল ওরা, ওটা ব্যবহার করলে স্নো-ক্যাট নিয়ে সরাসরি আই.আই.ফাইভে উঠতে পারত। স্নো-ক্যাট পোলার প্যাকে রাখল ওরা, বাকি পথটুকু এগোল পায়ে হেঁটে। পাহাড়ের পিছনে পৌঁছে থামল দলটা। ক্লাইম্বিং ইকুইপমেন্ট সাথেই আছে, চূড়ায় উঠতে অসুবিধে হলো না। পাহাড়ের মাথায় উঠে কম্পাস ব্যবহার করল জুনায়েভ, দেখে নিল কোন দিকে উত্তর।

বোল্ডারের মাঝখান দিয়ে নেমে এল ওরা। খানিক দূর হেঁটে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কর্নেল। 'কোথাও ভুল হয়েছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না কেন?'

ভুল অবশ্যই হয়েছে। শেষবার আকাশ থেকে আই.আই.ফাইভের ফটো তোলার পর দ্বীপটা কয়েক ডিগ্রী ঘুরে গেছে। তবে ভাগ্য ভাল ওদের, খানিক খোঁজাখুঁজি করতেই আই.আই.ফাইভের ঘরগুলো দৃষ্টিগোচর হলো।

হেডকোয়ার্টার হাটের সামনে একটা ল্যাম্প জ্বলছিল, সেটা দেখেই টলতে টলতে এগিয়ে এল ওরা। দস্তানা পরা হাত দিয়ে হাতুড়ি পেটার মত আওয়াজ করল কর্নেল দরজায়। সেই সাথে হেঁড়ে গলায়, ইংরেজীতে, হুঙ্কার ছাড়ল, 'গেস্ট!'

কেউ দরজা খুলবে তার সময় দিল না কর্নেল, নিজেই ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল। ঘরের ভেতর আলোটা আরও বেশি উজ্জ্বল, কুয়াশা থেকে এসে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কপালে হাত তুলে চোখে

ছায়া ফেলল সে। তিনজন লোক রয়েছে ঘরে, তাই থাকার কথা। বাংকে বসে রাইফেল পরিষ্কার করছে একজন, মাজ্‌ল্‌টা দরজার দিকে তাক করা। দরজার পাশে আরেকজন, তার এক হাতে রাইফেল, আরেক হাতে ছেঁড়া কম্বলের টুকরো। বয়স্ক আরেকজন লোক টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, হাত দুটো বুকে বাঁধা, খাড়া শিরদাঁড়া।

‘ঢোকার ইচ্ছে থাকলে তাড়াতাড়ি,’ রাইফেল পরিষ্কার করতে করতে বলল রানা। ‘তা না হলে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিন।’ রাইফেলের মাজ্‌ল্‌ কর্নেলের বুকের দিকে উঠল। ‘না!’ হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলল রানা। ‘শুধু আপনি একা—বাকি সবাই বাইরে অপেক্ষা করবে।’

কর্নেলের পিছনে ফার মোড়া আরও লোক রয়েছে, প্রত্যেকে তার চেয়ে অন্তত এক ফুট ছোট। লোকগুলো নড়েচড়ে উঠল, ভেতরে একা ঢুকল কর্নেল। একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে। ‘এন.পি. সেভেনটিন থেকে আসছি আমরা…’

‘দরজাটা বন্ধ করতে বলেছি আমি,’ শান্ত কণ্ঠে কর্নেলকে বাধা দিল রানা।

‘ড. জুনায়েভকে এখানে আপনাদের দরকার হবে,’ বলল কর্নেল। রানাকে দেখে ধিকিধিকি জ্বলতে শুরু করেছে তার চোখ। ‘অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারে আপনাদের সাবধান করতে চায় সে।’

‘ঠিক আছে, জুনায়েভ আসতে পারে। আর কেউ নয়।’

‘কিন্তু বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা…,’ শুরু করল কর্নেল।

‘কেউ আপনাদের দাওয়াত দেয়নি।’

রাগের মাথায় নয়, বুদ্ধির ওপর ভর করে কাজ করছে কর্নেল বলটুয়েভ। দেখামাত্র মাসুদ রানাকে গুলি করার ইচ্ছেটা জাগলই না মনে, বরং শঙ্কিত হয়ে উঠল রানার রাইফেল তার দিকে তাক করা রয়েছে দেখে। দরজার পাশে দাঁড়ানো নিয়াজ বাইরে যারা রয়েছে তাদের মুখের ওপর দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা। ঘরের চারদিকে দ্রুত তাকিয়ে ইভেনকো আছে কিনা দেখে নিল কর্নেল। কাঠের একটা বাক্সের ওপর ড্রিলিং কোর দেখল, পাশে একটা আইস-পিক। টেবিলের ওপর ফ্লাস্ক আর কাপ। যথেষ্ট লম্বা কর্নেল, কাবার্ডের মাথায় পাশাপাশি দাঁড়ানো ভদকার বোতল দুটোও দেখল। ভিজে পারকা খুলে একটা চেয়ারের পিছনে রাখল সে। 'আমার নাম কলোনভ,' দ্বিতীয়বার ঘরের চারদিকে চক্কর দিল তার দৃষ্টি। 'অনেকগুলো সোভিয়েত রিসার্চ বেসের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, এন.পি. সেভেনটিনেরও। নিকিতা জুনায়েভ ওখানকার মেডিকেল অফিসার। আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য, আপনারা সবাই ভাল তো?'

'কোন কারণ ঘটেছে ভাল না থাকার?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'কুয়াশার ভেতর দিয়ে আসার সময় কিসের যেন একটা গন্ধ পেলাম, পোড়া পোড়া...'

'আমাদের অয়্যারলেস হাট পুড়ে গেছে,' বিস্ফোরিত হলো ড. কর্ডন। 'কোন ম্যানিয়াকের কাজ, ইচ্ছে করে পুড়িয়ে দিয়েছে। কাজটা কার বা কাদের জানেন বলেই কি জিজ্ঞেস করছেন আমরা ভাল আছি কিনা?'

মনে মনে খুশি হলো রানা, চাইছিল ঠিক এভাবেই হঠাৎ করে বলা হোক কথাগুলো। যা আশা করেছিল, কর্নেলকে নিমেষের

জন্যে হলেও থতমত খেতে দেখল ও। 'ব্যাপারটা সিরিয়াস। এটা স্যাবোটাজ। কাজেই গ্রীনল্যান্ডে রিপোর্ট করতে হয়েছে আমাদের। দায়ী যে-ই হোক, মাসুল তাকে দিতেই হবে।' মনে মনে রানা আশা করছে, যাবার আগে কলোনভ ওরফে কর্নেল বলটুয়েভ কিছু একটা ইঙ্গিত বা আভাস দেবে যাতে বুঝতে পারবে ও, ওকে বন্ধু হিসেবে নিচ্ছে রাশিয়ানরা। কিন্তু লোকটার চোখ জোড়া ধিকিধিকি জ্বলছে দেখে আরও সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল ও।

'আগুন ধরে গেছে, ধরতেই পারে–দুর্ঘটনা ঘটে না?' তারপরই ব্যঙ্গের সাথে জিজ্ঞেস করল কর্নেল, 'সিগন্যাল পাঠিয়েছেন গ্রীনল্যান্ডে? তা কিভাবে সম্ভব হলো বলবেন কি? ট্র্যান্সমিটারই যেখানে পুড়ে গেছে...'

'স্পেয়ার ট্র্যান্সমিটার থাকতে নেই বুঝি?' হাসল রানা। 'বিশ্বাস না হয়, নিজেদের বেসে ফিরে গিয়ে মনিটরিং ইউনিটকে জিজ্ঞেস করুন।'

অপেক্ষা করছে রানা। বোঝাই যাচ্ছে, সিগন্যালের ব্যাপারে কর্নেলকে কিছু বলা হয়নি। খুন-খারাবির ইচ্ছা থাকলে বাতিল করে দেবে সেটা, অবশ্য সিগন্যালের কথাটা যদি বিশ্বাস করে। জানে গ্রীনল্যান্ডকে সতর্ক করার পর এখন যদি আই.আই. ফাইভের কারও কিছু ঘটে, আমেরিকানরা রাশিয়ানদেরই দায়ী করবে, এবং প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না। সিগন্যালের কথা যদি বিশ্বাস না-ও করে, তবু মনে একটা দ্বিধা জাগবে কর্নেলের, ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটিয়ে বসার আগে চিন্তা-ভাবনার জন্যে সময় নেবে। এই সময়টুকু রানার দরকার।

'মনিটরিং ইউনিট?' হতভম্ব দেখাল কর্নেলকে।

রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়াল রানা, দুই শত্রু মুখোমুখি হলো। ‘ন্যাকামি রাখুন। আই.আই. ফাইভের সিগন্যাল শোনার জন্যে আড়িপাতা যন্ত্র সেই প্রথম থেকেই ব্যবহার করেছেন আপনারা।’ কর্নেলের সামনে দাঁড়াবার কারণ আর কিছুই নয়, লোকটার কাছ থেকে চোখ-ইশারা বা ওই ধরনের কোন সঙ্কেত আশা করছে ও।

কিন্তু কর্নেল বলটুয়েভের চোখে নগ্ন ঘৃণা আর খুনের নেশা ছাড়া আর কিছুই দেখল না রানা। কাছ থেকে দেখে পরিষ্কার হয়ে গেল, এ লোক শত্রু ছিল শত্রুই আছে, বন্ধুত্বের সন্দেশ নিয়ে আসেনি।

ট্রাউজারের পকেটে হাত দুটো ভরল ড. কর্ডন, তালুর ঘাম লুকাতে চাইছে। রাশিয়ানরা দু’একজন এর আগেও আই.আই. ফাইভে এসেছে, কিন্তু এভাবে দলবেঁধে বা যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়ে আসেনি। ইভেনকো রুস্তভ মাত্র কয়েক গজ দূরে শুয়ে আছে, ব্যাপারটা ভুলতে পারছে না সে।

রাশিয়ানরা রেডিও-রূম পুড়িয়ে দিয়েছে শুনেই রানার সন্দেহ হয়েছিল, কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে। কথা ছিল ইভেনকোকে পালিয়ে আসতে দেবে ওরা, তাকে নিয়ে যাতে নিরাপদে পালিয়ে আসতে পারে সেজন্যে আমেরিকানদের অগোচরে রানাকে সাহায্যও করবে। কিন্তু রেডিও-রূম পুড়িয়ে রাশিয়ানরা ঠিক উল্টো আচরণ করল। এখন কর্নেল বলটুয়েভের সামনে দাঁড়িয়ে সন্দেহটা বিশ্বাসে পরিণত হলো—ইভেনকোকে পালিয়ে যেতে দিক বা না দিক, ওকে তারা খুন করবে প্রথম সুযোগেই।

গ্রীনল্যান্ডে সিগন্যাল পাঠানোটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। এতগুলো লোকের চোখের সামনে রানাকে একা মেরে রেখে

যাওয়া সম্ভব নয়। আবার সাক্ষী রাখতে না চাইলে সবাইকে মারতে হবে, প্রতি-আক্রমণের ভয়ে তা-ও সম্ভব নয়।

'এ-সব প্রসঙ্গে কথা বলার জন্যে আসিনি আমি,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল কর্নেল। 'সঠিক জানি না, তবে আমার সন্দেহ, আমাদেরই কোন একজন লোক আপনাদের রেডিও-রূমে আগুন ধরিয়ে থাকতে পারে।'

'ইনভেস্টিগেশন শুরু হলে আসল তথ্য বেরিয়ে আসবে,' বলল রানা। 'ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনে খবরটা পৌঁছে গেছে। আর আপনি তো জানেন, স্যাবোটাজকে কি চোখে দেখে আমেরিকানরা।'

'এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আপনি আমেরিকান নন...,' রানার দিকে খানিক ঝুঁকল কর্নেল।

'আর আপনি এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আপনি কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ নন!' একই সুরে ব্যঙ্গ করল রানা।

'আপনি আমাকে চেনেন?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

'আমাকেও আপনি চেনেন,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা।

'কেউ যাতে আতঙ্ক বোধ না করে সেজন্যে অনেক সময় মিথ্যে পরিচয় দিতে হয়,' চোখ পাকিয়ে বলল কর্নেল।

'আমারও সেই কথা,' রানার গলায় শ্লেষ ঝরল।

'জানতে পারি, আমেরিকান আর্কটিক বেসে আপনি কেন?'

হাঁ হয়ে গেল রানা, কৃত্রিম বিস্ময়ে। 'সেকি! কে.জি.বি. কিছুই জানায়নি আপনাকে?' পুরো পাঁচ সেকেন্ড সময় দিল ও, কর্নেল যাতে আভাসে হলেও ইতিবাচক কোন জবাব দেয়। কিন্তু কোন

সাড়াই পাওয়া গেল না। তারপর আবার বলল রানা, ‘শুনেছি কে.জি.বি. নাকি দুনিয়ার সব খবরই রাখে, এখন দেখছি কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়।’

‘যে কারণেই আপনি মরতে এসে থাকেন, আমি জানতে চাই না,’ বলল কর্নেল। ‘আমার কথা হলো…’

‘তার আগে শুনুন,’ বাধা দিল রানা, ‘কালকের সমস্ত কাগজে হেডিং থাকবে—রাশিয়ানরা মার্কিন ঘাঁটির ওপর হামলা চালিয়েছে।’

‘কি আবোলতাবোল বকছেন!’

‘কালকের কাগজ দেখতে ভুলবেন না।’

অনেক বছর পর আজ এই প্রথম ঘাবড়ে গেল কর্নেল বলটুয়েভ। সত্যি যদি সিগন্যাল পাঠানো হয়ে থাকে, এখানে তার কোন রকম বাড়াবাড়ি করা চলবে না, উপলব্ধি করল সে। ফার্স্ট সেক্রেটারি পই পই করে বারণ করে দিয়েছেন, কোন রকম ইন্টারন্যাশনাল ইনসিডেন্ট যেন না ঘটে। ‘আমি পিটার আন্তভ সম্পর্কে আপনাদেরকে সাবধান করে দিতে এসেছি। আন্তভ একজন জুনিয়র ওশেনোগ্রাফার। সে পাগল হয়ে গেছে, আমাদের একজন লোককে, বেচারা ইভেনকো রুস্তভকে, খুন করে পালিয়েছে। এদিকেই এসেছে সে, স্লেজ টীম নিয়ে। ইভেনকোকে খুন করে তার কাগজ-পত্রও সাথে করে নিয়ে এসেছে আন্তভ, নিজেকে সে ইভেনকো বলে চালাবার চেষ্টা করতে পারে…’

‘কেন, তা সে কেন করতে যাবে?’

‘কারণ নিজের কাগজ-পত্র ঘরে রেখে এসেছে,’ শান্ত গলায় বলল কর্নেল। ‘সে জানে, আপনারা তার পরিচয়-পত্র দেখতে চাইবেন।’

‘পাগল হয়ে গেছে বুঝলেন কিভাবে?’ কর্নেলের সাথে একাই কথা বলছে রানা।

কটমট করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল কর্নেল। ‘আই.আই. ফাইভের রেডিও-রূম পুড়িয়ে দিয়েছে, তার আগে খুন করেছে ইভেনকোকে–এরপরও বুঝতে বাকি থাকে?’ রানার দিকে এক পা বাড়াল সে। ‘শুনবেন, কিভাবে খুন করা হয়েছে ইভেনকোকে? প্রথমে তার বুকে আইস-পিক ঢোকানো হয়েছে, তারপর যেভাবে বেয়নেট চার্জ করে, গোটা মুখ ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে। এখনও বুঝতে পারছেন না সে একটা ম্যানিয়াক? তিন বছর আর্কটিকে থেকে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছে। হয়তো কাছে পিঠেই কোথাও আছে সে, খুনের নেশায় ছটফট করছে...’

‘তাহলে এখনও এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কি মনে করে?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘যান, খুঁজে বের করুন।’

হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল কর্নেল। ইঙ্গিতে জুনায়েভকে দেখাল সে। ‘ব্যাপারটা নিয়ে আমরা ভারি উদ্বিগ্ন। সব শোনার পর আপনারাও চাইবেন আমরা এখানে থেকে যাই। ড. জুনায়েভ সম্ভবত আমার চেয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন। বসতে পারি?’ কেউ রাজি হবার আগেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল অনাবিল হাসি। ‘শুরু করো, জুনায়েভ...’

‘আন্তভ একটা সাইকোপ্যাথ...,’ ভাঙা ইংরেজীতে শুরু করল জুনায়েভ।

হাত তুলল রানা। ‘আমরা কেউ মেডিকেল কলেজের ছাত্র নই, কাজেই লেকচার শুনতে চাই না।’ কর্নেলকে আবার দাঁড় করাতে চায় ও। ‘আপ্যায়ন করতে পারলাম না বলে দুঃখিত, এবার যদি

সম্মানিত মেহমানরা...,' ইচ্ছা করেই কথা শেষ করল না রানা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কর্নেল। দস্তানা পরা হাত দুটো ঘন ঘন মুঠো করছে আর খুলছে—প্রচণ্ড রাগের লাগাম টেনে রাখার চেষ্টা। সাবধানে, বলটু, সাবধানে, নিজেকে সতর্ক করে দিল সে। কিভাবে যেন গোটা ব্যাপারটা উল্টে গেছে: এসেছিল আমেরিকানদের মনে ভয় ধরিয়ে দিতে, অথচ নিজেই তাল হারিয়ে ফেলেছে। 'আমরা এসেছিলাম আপনাদের সাবধান করে দেয়ার জন্যে,' টেবিল থেকে পারকা তুলে নিয়ে বলল সে। 'ভেবেছিলাম আপনাদের সহযোগিতা পাব...'

'সবগুলো আশাই আপনার পূরণ হয়েছে,' বলল রানা। 'আমরা সাবধান হয়ে গেছি। আমরা সহযোগিতা করেছি, যা যা বলেছেন মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। কিন্তু এ-ও আপনাকে বুঝতে হবে যে আমাদের নিজেদেরও কিছু কাজ আছে।'

'ভাবছিলাম, আপনাদের ঘরগুলো সার্চ করার প্রস্তাব দেব—আপনাদের একজন ইচ্ছে করলে আমাদের সাথে থাকতে পারেন। বলা তো যায় না, আন্তভ হয়তো একটা ঘরে লুকিয়ে আছে।'

'রেডিও-রূম পুড়তে দেখে আমরাই সার্চ করেছি...'

রাগে ফেটে পড়ল ড. কর্ডন, 'তামাশা নাকি? কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভুলে যাবেন না, মি. বলটুয়েভ। ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার টেরিটরিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন আপনি। আপনার সাহস তো কম নয়, সার্চ করতে চান!'

পারকার বোতাম লাগাতে লাগাতে কর্নেল বলল, ড. কর্ডনের কথা যেন শুনতেই পায়নি, 'বন্ধু হিসেবে বলছি, প্লেন না আসা

পর্যন্ত বেস ছেড়ে কোথাও না গেলেই ভাল করবেন। সেটাই আপনাদের জন্যে নিরাপদ...'

'কি থেকে নিরাপদ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কুয়াশার ভেতর কাউকে নড়তে দেখলে আমার লোকেরা গুলি করবে– আন্তভ মনে করে,' গম্ভীর সুরে বলল কর্নেল। 'ওদের আমি বলে দিয়েছি, যদি সম্ভব হয় অক্ষত অবস্থায় ধরবে তাকে। কিন্তু ওরা যারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তারা সবাই ইভেনকোর বন্ধু, আন্তভের ওপর খেপে আছে। প্রত্যেকে ওরা সশস্ত্র।' মাথায় ফার হুড পরল সে। 'জুনায়েভ, সহযোগিতা যখন পেলামই না, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই।' রানার দিকে ফিরল সে। 'চলি, মি. মাসুদ রানা। আমি জানি, আবার আমাদের দেখা হবে।'

জুনায়েভকে নিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেল কর্নেল।

পিছন থেকে রানা বলল, 'আমি তৈরি থাকব, কর্নেল বলটু।'

ওরা চলে যাবার পর নিয়াজকে পাঠাল রানা, সত্যি ওরা চলে গেছে কিনা দেখে আসার জন্যে। নিয়াজ বেরিয়ে যাবার পর ড. কর্ডনের দিকে ফিরল ও। বেস লীডার রুমাল দিয়ে হাতের ঘাম মুছছে। 'ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠল,' বলল রানা। 'কর্নেল পয়মাল বলটুয়েভ স্পেশাল সিকিউরিটি সার্ভিসের লেনিনগ্রাদ চীফ, ওয়াশিংটন থেকে রওনা হবার আগে আমি ওর ফটো দেখেছি।' ঘড়ি দেখল রানা। পৌনে একটা। 'সকাল আটটায় ইভেনকোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব আমরা, স্লেজে করে।'

'সকাল আটটায় কেন?'

'বাকি রাতটুকু পোলার প্যাক চষে ক্লান্ত হয়ে পড়বে ওরা

সবাই। আটটার দিকে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে। তবে আমরা রওনা হবার সময় একটা ডাইভারশন দরকার হবে।'

একগাল হাসল ড. কর্ডন। 'একটা স্নো-ক্যাট নিয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করব। র‍্যাম্প থেকে পোলার প্যাকে নেমে বেশ খানিক দূরে চলে যাব—ইভেনকো পালাচ্ছে মনে করে পিছু নেবে ওরা।'

ক্লান্তিতে চোখ আপনা থেকে বুজে এল রানার। ঘুম তাড়াবার জন্যে পায়চারি শুরু করল ও। 'এখানে ওরা স্নো-ক্যাট নিয়ে এসেছিল, আল্লাই জানে কিভাবে। কোন ধরনের মোবাইল রাডারও ছিল সাথে। আপনি স্নো-ক্যাট নিয়ে বেরুলে সহজেই ধাওয়া করতে পারবে ওরা। এদিক থেকে আমরা পশ্চিমে রওনা হব।'

ড. কর্ডন কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে আবার বলল রানা, 'কিন্তু আপনার কি হবে?'

'ধাওয়া করলেও, ওরা আমাকে ধরতে পারবে না,' বলল কর্ডন। 'চক্কর দিয়ে এক সময় বেসে ফিরে আসব আমি, ততক্ষণে আপনারা পগার পার...'

'কিন্তু আপনি কি আই. আই. ফাইভের পুব দিকে এর আগে স্নো-ক্যাট চালিয়েছেন?'

'কি যে বলেন! তিন বছর ধরে আছি না এখানে!'

পরবর্তী আধঘণ্টা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। কুকুরগুলোর সাথে পাশের ঘরে ছিল বিনয়, তাকে ডেকে আনা হলো। বন্ধ ঘরের ভেতর ছিল অচেতন রডেনবার্গের সাথে কাজম্যান, তাকেও বের করে আনা হলো। রডেনবার্গের মত কাজম্যানও ইভেনকোর উপস্থিতি সম্পর্কে কিছু জানে না।

হেডকোয়ার্টার হাটে থাকতে বলা হলো ড. কর্ডন আর

কাজম্যানকে, বিনয়কে নিয়ে ইভেনকোকে ‘রেফ্রিজারেটর’ থেকে বের করতে গেল রানা। নামকরণটা, বলাই বাহুল্য, নিয়াজের। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, আগের মতই ঘুমিয়ে আছে ইভেনকো। ট্র্যাপ-ডোর থেকে তাকে বের করতে হিমশিম খেয়ে গেল রানা আর বিনয়। কাঁধে তুলে নিয়ে রিসার্চ রূমে নিয়ে আসা হলো তাকে, আগে থেকেই এখানে একটা বাংক তৈরি রাখা হয়েছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ড. কর্ডন, সেই সাথে চোখ খুলল ইভেনকো রুস্তভ।

‘এ আমি কোথায়?’ চোখ খুলেই জিজ্ঞেস করল ইভেনকো। ‘প্রথমে তো এখানে আমাকে রাখা হয়নি।’

বয়স হলেও, শরীর ও মন দুটোই এখনও শক্ত আছে ভদ্রলোকের। রানা ভাবল, তা না হলে কি পালিয়ে আসার দুঃসাহস হয়! ওর ইঙ্গিতে ড. কর্ডন পরীক্ষা করল ইভেনকোকে।

মনে মনে অস্থির হয়ে আছে রানা। হিসেবে ওর ভুলও হতে পারে। অভ্যর্থনার ধরন দেখে কর্নেল বলটুয়েভ ধাক্কা খেয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে ধাক্কা সামলে নিতে সকাল আটটা পর্যন্ত সময় না-ও লাগতে পারে তার। আই.আই. ফাইভে আবার যদি সে হানা দেয়, কিছুই আশ্চর্য হবার নেই।

‘উনি সম্পূর্ণ সুস্থ,’ পরীক্ষা শেষ করে সিধে হলো ড. কর্ডন। ‘আশ্চর্যই বলব! এরকম একটা ধকল সহ্য করার পর…’

এক মুহূর্ত দেরি না করে ইন্টারোগেশন শুরু করল রানা, তার আগে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ড. কর্ডনকে বের করে দিল ঘর থেকে। বছর তিনেক আগে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অনেক সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্যে রাশিয়ার বাইরে আসতে হয়েছে ইভেনকোকে, ইংরেজীটা মোটামুটি ভালই বলতে পারে।

রানার প্রথম প্রশ্ন, ‘আপনি কি স্বেচ্ছায় চলে এসেছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘শুধু আমাকে পাঠালে আমেরিকায় আসবেন, এই শর্ত দিয়েছিলেন কেন?’

নিঃশব্দে হাসলেন রুশ বিজ্ঞানী। ‘আপনি আমার হিরো, তাই। যে লোক রাশিয়া থেকে মিগ-একত্রিশ নিয়ে যেতে পারে, তার অসাধ্য কিছু থাকতে পারে না। মনে হলো, কেউ যদি নিরাপদে আমাকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে পারে তো সে মাসুদ রানা।’

‘আমি যদি আপনার আবদার না রাখতাম?’

এক কথায় জবাব দিল ইভেনকো, ‘আসতাম না।’

‘সাথে করে যেটা এনেছেন, মেরিলিন চার্ট—আসল, না নকল?’

‘হোয়াট!’

‘আমার সন্দেহ, আমেরিকানদের বোকা বানাবার জন্যে নকল চার্ট দিয়ে আপনাকে পাঠানো হয়েছে,’ বলল রানা।

রাগে কাঁপতে শুরু করল ইভেনকো, ‘এ আপনি কি বলছেন!’

‘চার্টটা তাহলে নকল নয়? আপনার মধ্যে তাহলে কোন ছল-চাতুরি নেই?’

বোকার মত কিছুক্ষণ রানার দিকে তাকিয়ে থাকার পর ইভেনকো বলল, ‘এসব কি প্রশ্ন করছেন আপনি! প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে, শুধু ওদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে এসেছি আমি। নকল চার্ট আনলে আমেরিকানরা আমাকে আস্ত রাখবে?’

‘কে.জি.বি. বা আর কোন প্রতিষ্ঠান আমার সম্পর্কে আপনাকে কিছু জানায়নি?’

‘কেন জানাবে?’ হতভম্ব দেখাল বিজ্ঞানীকে। ‘আমি তো কিছুই

বুঝতে পারছি না…'

যা বোঝার বুঝে নিল রানা, স্বেচ্ছায় পালিয়ে এসেছে ইভেনকো। কে.জি.বি.র গোপন নির্দেশে নয়। কিন্তু চার্টটা? সেটা নকল, না আসল?

'শেষবার কিয়েভে গেছেন কবে?'

'গত সপ্তায়।'

'কোন আত্মীয়ের সাথে দেখা হয়েছে?'

'আমার ভাই, ইউরি রুস্তভের সাথে।'

'সে কি নেভীতে আছে?'

'না, ট্রলারে।'

'আপনার প্রেমিকার নাম? যে মারা গেছে?'

চেহারা কঠিন হয়ে উঠল ইভেনকোর। 'ওর সাথে আমার বিয়ে হতে যাচ্ছিল…'

'আমি তার নাম জানতে চেয়েছি,' বলল রানা।

'সুমাইয়া নাজিন। কিন্তু আপনি আমাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'দরকার আছে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আধ ঘণ্টাও হয়নি, এই ঘরে দাঁড়িয়ে ছিল কর্নেল বলটুয়েভ।'

আতঙ্কে নীল হয়ে গেল ইভেনকোর চেহারা। ঘরের চারদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাল সে, যেন কোণঠাসা একটা ইঁদুর। কিছু বলতে চেষ্টা করেও পারল না, ঘন ঘন ঢোক গিলল শুধু। ওয়াশিংটনে ইভেনকো রুস্তভের কোন ফটো নেই, ভদ্রলোকের প্রতিক্রিয়া দেখে বোঝা গেল, এ লোক কর্নেল বলটুয়েভের পাঠানো কোন স্পাই অন্তত নয়।

অনুমতি না নিয়েই ঘরে ঢুকল ড. কর্ডন। বিরূপ দৃষ্টিতে রানার দিকে একবার তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। ব্র্যান্ডির বোতল থেকে গ্লাসে খানিকটা ঢালল সে, ধরিয়ে দিল ইভেনকোর হাতে। থমথমে গলায় জানাল সে, 'রিসার্চ রূমে কমরেডের জন্যে খাবার তৈরি হচ্ছে।'

ব্র্যান্ডিটুকু খেয়েও সুস্থির হতে পারল না ইভেনকো। বাঙ্কের কিনারায় বসে বারবার শুধু মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে।

ইন্টারোগেশন শেষ হলো, এরপর পায়চারি শুরু করল সে। চেয়ারে শুকাচ্ছে তার পারকা, মাঝে মধ্যেই সেটার কাছে থামল। কিন্তু একবারও ছুঁলো না। লক্ষ রাখছে, কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে কিনা। যখন বুঝল, কেউ তাকিয়ে নেই, সুযোগটা নিল। দ্রুত পারকার পকেটে হাত গলিয়ে দেখে নিল টিউবটা জায়গামত আছে কিনা। এরপর আবার বাঙ্কে ফিরে এসে বসল সে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিয়াজ, অন্য দিকে চোখ। আপনমনে হাসল সে।

বাকি রাতটুকু না ঘুমালে মারা যাবে রানা। হেডকোয়ার্টার হাটে শুতে যাচ্ছে বলে বেরিয়েছে, এই সময় সবাই ওরা আওয়াজটা শুনতে পেল।

প্লেনের আওয়াজ।

জেনারেল ফচ স্যাবোটাজ সিগন্যাল পেয়ে হারকিউলিস ওয়ান-থ্রী-জিরো ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন পাঠিয়েছেন আই.আই.ফাইভে। বরফদ্বীপের মাথার ওপর ঘুরছে ওটা, যদি ল্যান্ড করার সুযোগ মেলে।

আমেরিকান ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনের আওয়াজ শুনতে পেল কর্নেল বলটুয়েভ। পোলার প্যাক আর আই. আই. ফাইভের সেতুবন্ধন স্নো-র‍্যাম্পের কাছ থেকে কয়েকশো মিটার দূরে একটা স্নো-ক্যাটে বসে রয়েছে সে, পাশে জুনায়েভ। ঘন ঘন পাইপ টানছে কর্নেল।

'ল্যান্ডিং লাইট অন করেছে ওরা,' বলল সে। পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে আরও দূরে নিঃসঙ্গ একটা ঝাপসা আলো মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল সে, তারপরই সেটা ঢাকা পড়ে গেল কুয়াশায়।

'স্বাভাবিক,' বলল জুনায়েভ। 'সবাই চায় নিজেদের প্লেন নিরাপদে ল্যান্ড করুক।'

'আচ্ছা, এখনও তুমি মনে করো, ইভেনকো ওখানে নেই?'

'আমার বুদ্ধি আর কতটুকু, কর্নেল কমরেড!' বিনয়ে বিগলিত হলো জুনায়েভ। 'আপনি থাকতে আমি কোন্ সাহসে বুদ্ধি খাটাতে যাই!'

'ভেবেছিলাম আমাদের দেখে ওরা ভয় পাবে,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল কর্নেল। 'কিন্তু ঘটল উল্টোটা। বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, ঘৃণা—বলো, প্রত্যেকের চেহারায় এসবই তো দেখা গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল জুনায়েভ।

'সম্ভবত ইভেনকো এখনও পৌঁছায়নি ওখানে, কি বলো?'

'জ্বী—হ্যাঁ, মানে, না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ওরা। তারপর জুনায়েভ বলল, 'কিন্তু যদি পৌঁছে থাকে? আর যদি প্লেনটা ল্যান্ড করতে পারে?'

হেসে উঠল কর্নেল। 'তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ। দেখোই না কি হয়। যে চাল চেলেছি, মাসুদ রানাকে আর পালাতে হচ্ছে না!'

(পরবর্তী খণ্ডে সমাপ্য)

মরণখেলা-১

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে তীব্র বেগে
ছুটে চলেছে ফ্লোরিডা এক্সপ্রেস।
লম্বা জার্নি। চলন্ত ট্রেনের দোলায়
নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিলো রানা স্লীপিং কারে,
মৃদু মৃদু হাসছিল সুখ-স্বপ্নের ঘোরে।

হঠাৎ অজায়গায় থেমে দাঁড়ালো ট্রেন;
কয়েকজন ষণ্ডামার্কা লোক উঠে এলো। সি. আই. এ.!
অস্ত্রের মুখে নামানো হলো রানাকে ছোট্ট এক স্টেশনে,
গ্রেফতার করা হলো বিনা অপরাধে।

তারপর আবার কাজ চাপাতে চায়!
খেপে যাবে রানা—সেটাই স্বাভাবিক নয়?
কিন্তু ওরাও জোর খাটাবে, ভয় দেখিয়ে, টরচার করে
কাবু করতে চাইবে ওকে—সেটাও স্বাভাবিক।
নির্যাতনের এক পর্যায়ে রাজি হয়ে গেল রানা।
পাঠক, কি মনে হয়?
ও কি সাহায্য করবে সি. আই. এ.-কে?

সতের টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০